স্বামী বিবেকানন্দ :
সময় ও ইতিহাস চেতনা

স্বামী বিবেকানন্দ :
সময় ও ইতিহাস চেতনা

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়
এম. এ., পিএইচ. ডি., ডি. লিট.

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রথম প্রকাশ : ১২ জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার। প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা ৪
মুদ্রক : স্থবীর সিকদার। সিকদার প্রিণ্টার্স
১৫এ নলিন সরকার স্ট্রীট। কলিকাতা ৪

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

সুহৃদ্বরেষু

সূচি

বৃত্ত ও সরলরেখা ১৩

কালচক্র : প্রগতির কুহক ২০

শুভ ও অশুভ : জগৎটা কোঁকড়ানো লেজ ২৬

শেষ লক্ষ্য : এ পৃথিবী দেবভূমি ৩০

চেতনার সিঁড়ি ৩৩

জড়বাদ, রূপান্তর, প্রগতি ৪৫

শিক্ষা ও প্রগতি ৫৩

প্রসঙ্গ : নারী ৫৯

শ্রুতি ও স্মৃতি ৬৭

সমাজের বিবর্তন : বিভিন্ন বর্ণের আধিপত্য ৭০

শূদ্রের প্রাধান্য : সমাজতন্ত্র ৭৫

বর্ণভেদ : জন্মগত ও গুণগত ৭৮

ব্যষ্টি ও সমষ্টি : সমাজতন্ত্র কি মায়া ? ৮৪

ইতিহাসের ধারা ৯১

ভারতে ইংরেজশাসন : অমৃত ও গরল ৯৩

দেশপ্রেম : মানবপ্রেম : বিশ্বপ্রেম ৯৯

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

বৃত্ত ও সরলরেখা

…Human affairs form a circle, and… there is a circle in all other things that have a natural movement and coming into being and passing away. This is because all other things are discriminated by time, and end and begin as though conforming to a cycle, for even time itself is thought to be a circle.

Aristotle : *Physics*

…Man is perfectible… By perfectible it is not meant that he is capable of being brought to perfection. But the word seems sufficiently adapted to express the faculty of being continually made better.

William Godwin : *Political Justice*

The present and the past thou hast beheld :
It was a desolate sight. Now Spirit, learn
The secrets of the future.

Shelley : *Queen Mab*

…the law of organic evolution is the law of all evolution. Whether it be in the development of the Earth, in the development of life upon its surface, in the development of Society, of Government, of Manufactures, of Commerce, of Language, Literature, Science,

Art, this same advance from the single to the complex through successive differentiations, holds uniformly.

Herbert Spencer : *System of Synthetic Philosophy*

সময় প্রবাহের গতিনির্দেশ প্রসঙ্গে দুটি জ্যামিতিক চিহ্ন আমরা ভাবতে পারি : বৃত্ত ও ঋজুরেখা। হিন্দু শাস্ত্রে এবং গ্রীক দর্শনে কালের গতি বৃত্তাকার। ভোর, সূর্যোদয়, দুরন্ত দুপুরে সূর্য আকাশের মধ্যবিন্দুতে, তারপর সূর্যাস্ত। ক্রমে সন্ধ্যা নামে, অন্ধকার ঘন হয়, আবার ভোর, আবার সূর্যোদয়। একই চক্রাকারে চলে ঋতুর আবর্তন, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তের পুনর্বৃত্তি (এই আবর্তনের সঙ্গে কৃষিকাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক)। হিন্দুচিন্তায় এই আবর্তনেরই বৃহত্তর রূপ কল্প, কল্পান্ত, নতুন কল্পের আরম্ভ। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের মতে সৃষ্টির মূলসূত্র গতি ও পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন চক্রাকৃতি। আরিস্টট্‌ল্ 'পদার্থবিদ্যা' ও অন্যান্য গ্রন্থে কালের গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঘূর্ণমান বৃত্তের উপমা দিয়েছেন। সম্পূর্ণ অন্য এক জ্যামিতিক চিহ্ন প্রয়োগ করেছেন খ্রিস্টিয় তত্ত্ববিদ্ সন্ত অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০) : তাঁর মতে লৌকিক কাল একটি সরলরেখা। কিন্তু এই সরলরেখা অনাদি অন্তহীন নয়, এর দৈর্ঘ্য সীমিত। এর আরম্ভ আছে, মধ্যবিন্দু আছে, শেষ আছে। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করলেন বিশেষ একটি সময়ে, সেটি সরলরেখার আরম্ভ। যিশুর জন্ম-মৃত্যু-পুনরুত্থান সরলরেখার মধ্যবিন্দু। পরিশেষে সৃষ্টির ধ্বংস ও সরলরেখার সমাপ্তি। হিন্দু দর্শনে কালপ্রবাহ অনাদি অনন্ত। কল্পের আরম্ভ ও শেষ আছে, কালপ্রবাহের আদি বা অন্ত নেই।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, ফরাসী বিপ্লব থেকে য়ুরোপীয় চিন্তায় নতুন সময়চেতনার সূচনা। এক নতুন ইতিহাসচেতনা, যা প্রগতিবাদের সমার্থক। জড়বাদী দর্শন ও ডারউইনের উদ্‌বর্তনবাদ এই ইতিহাসচেতনার পরিপোষক (ডারউইনের পিতামহের একটি কাব্যগ্রন্থে এই উদ্‌বর্তনবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়)। জড় থেকে চেতনার উৎপত্তি ; সৃষ্টির ইতিহাস চেতনার ক্রম-বিবৃদ্ধির, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের কাহিনী। এই ধারণায়, সময় বা ইতিহাস একটি ঊর্ধ্বগ সরলরেখা, যে সরলরেখার কোনো প্রান্তসীমা বা ছেদ নেই। এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের দুই ইংরেজ কবি শেলি ও কীট্‌সের দুটি রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'প্রমিথিউসের বন্ধনমুক্তি' (*Prometheus Unbound*) নাটকে শেলি এক আদর্শ সমাজের ছবি এঁকেছেন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা এই সমাজের ভিত্তি, শ্রেণীহীন রাষ্ট্রশক্তিহীন এই সমাজে

প্রত্যেকটি মানুষ স্বয়ংশাসিত, বাইরের কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য তর্জনী এখানে মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করে না। পরিবর্তন আছে, রূপান্তর আছে, মৃত্যু আছে ; তবু মানুষ এখানে যন্ত্রণার শিকার নয়, সবরকম দাসত্ব থেকে সে মুক্ত। নাটকের আরম্ভে শীত ঋতু, রাত্রির শেষ প্রহরের অন্ধকার। ক্রমে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে, ভোর হয়, মানুষের মুক্তি আসে মধ্যাহ্নে, শীতের বরফ গলিয়ে আসে বসন্ত। এই সূর্যালোকদীপ্ত মধ্যাহ্ন, এই বসন্ত ঋতু মানুষের মুক্তির দ্যোতক। অন্ধকার থেকে আলোয়, শীত থেকে বসন্তে উত্তরণের এই কাব্যে একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন লুকিয়ে আছে : এই আদর্শ সমাজব্যবস্থা কি ইতিহাসের চরম ও পরম সত্য ? তীর্থযাত্রীর চলার পথ কি এখানেই শেষ ? এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর নাটকে নেই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। শুভাশুভের দ্বন্দ্বে অশুভ শক্তি এখানে সম্পূর্ণ পরাজিত ; কিন্তু নাটকের শেষে অন্য একটি ইঙ্গিত আছে, যা অসতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। তৃতীয় অঙ্কে মনে হয়েছে, অশুভশক্তি চিত্রকরের আঁকা বীভৎস মুখোশ ছাড়া কিছু নয় ; ইচ্ছার দৃঢ়তায়, প্রজ্ঞা ও প্রেমের শক্তিতে মানুষ এই মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু নাটকের শেষে দেখি, অশুভশক্তি বহিরঙ্গমূলক নয়, জীবনের গভীরে প্রোথিত। বিষধর সাপের মৃত্যু হয়নি, সাময়িকভাবে সে গর্তবন্দী ; নৈতিক বিধানের অজ্ঞেয় লীলায় বা অক্ষমতায় সে আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তখন আবার মানুষকে নতুন করে সংগ্রাম করতে হবে, যে সংগ্রামের হাতিয়ার প্রেম ক্ষমা তিতিক্ষা। উপসংহারের ব্যঞ্জনায় ইতিহাসের গতিপ্রবাহও নতুন মোড় নিয়েছে : সময়ের সরলরেখা বেঁকে গেছে, আবর্তমান চক্রের রূপ নিয়েছে। কীট্‌সের 'হাইপেরিয়ন' (*Hyperion*) কাব্যে এই সরলরেখার কোনো প্রান্তিক সীমানা নেই, মানুষের অগ্রসরণের কাহিনীতে চরম পূর্ণতা বলে কিছু নেই। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে চেতনার ক্রমোন্মেষ, কোনো স্তরেরই পরম মূল্য নেই, সব মূল্যই আপেক্ষিক এই অসমাপ্ত কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ লেখার পরেই কবির ছোট ভাইয়ের মৃত্যু হয়, তাঁর জীবনদর্শনে মৌল পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী কবিতাগুলিতে সময়ের রূপ পাল্‌টে গেছে : কবি ফিরে গেছেন ঘূর্ণায়মান বৃত্তে, যে বৃত্ত এক অর্থে মানুষের বন্দিত্বের প্রতীক।

প্রগতি ও অভিব্যক্তিবাদে আস্থাশীল আধুনিক মানুষের কাছে সময় বা ইতিহাস একটি অন্তহীন ঊর্ধ্বগতি সরলরেখা—বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার এই প্রগতিচেতনাকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু এই প্রগতিবাদ দুটি প্রশ্নের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। প্রথম প্রশ্ন : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবল শক্তিতে মানুষ চাঁদে নেমেছে, কিন্তু

তার নৈতিক চেতনা জৈবিক স্তর ছাড়িয়ে কতটুকু উঠতে পেরেছে ? দ্বিতীয় প্রশ্ন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে। বিজ্ঞানের একটি আবিষ্কার—তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়ম (Second Law of Thermodynamics)—নিরবচ্ছিন্ন প্রগতিবাদকে আঘাত করেছে ; বৈজ্ঞানিকদের মনে সংশয় জেগেছে, পৃথিবী হয়তো একদিন প্রাকৃতিক নিয়মেই ধ্বংস হয়ে যাবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল একটি নিবন্ধে বলেছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে একদিন বিশ্বের অবলুপ্তি হবে, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চেতনা এক মর্মান্তিক পরিহাস সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা—সৃজন ও বীক্ষণে মানুষের প্রতিভার অলৌকিক স্ফুরণ কি তবে অর্থহীন ? তবু এই অর্থহীনতার মধ্যেই অর্থের সন্ধান করতে হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এ কর্ণের উক্তি স্মর্তব্য : 'এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে / অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে / জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন কর্মের উদ্যম'। ফরাসী লেখক কামুর ভাষায়, স্বচ্ছ চেতনার আয়নায় এই কিম্ভূত অস্তিত্বকে দেখে যেতে হবে। মুমূর্ষু সূর্যের তত্ত্ব আজ আর বৈজ্ঞানিকরা মানেন না, কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভ ও প্রোটনের ক্ষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে—বিশেষভাবে মহীশূরের স্বর্ণখনির গভীর কন্দরে—যে গবেষণা চলছে, তাতে হয়তো প্রমাণিত হবে যে এই বিশ্বের আয়ু সীমিত। সব জিজ্ঞাসু মানুষ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় একটা কথা আশা করি পরিষ্কার হবে যে সময় ও ইতিহাসের গতিপ্রবাহ শুধু একটা তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, আমাদের অস্তিত্বের তাৎপর্য ও লক্ষ্য এই প্রশ্নের উত্তরে লুকিয়ে আছে। এই মৌল প্রশ্ন স্বামী বিবেকানন্দকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল ; তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার একটি বৈশিষ্ট্য প্রাচীন ভারতীয় মীমাংসা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনার মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস।

২

স্বামী বিবেকানন্দ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু নিজেকে তিনি অভিহিত করেছেন বুদ্ধের 'দাসানুদাসরূপে'।[১] ত্যাগ, প্রেম, করুণা, পরার্থপরতা, প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের প্রবক্তা, পুরোহিততন্ত্র ও সবরকম ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্রোহী। বিভিন্ন ভাষণে ও রচনায় বিবেকানন্দ বুদ্ধের অহেতুকী প্রেম ও বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ-

দর্শনেও তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ অনাত্মবাদ তিনি গ্রহণ করেননি। মূলত তিনি হিন্দুধর্মেরই অনুবর্তী, বৈদান্তিক দর্শনেই তিনি জীবনরহস্যের সূত্র খুঁজেছেন, পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন অদ্বৈতবাদকে। তাঁর সময়চেতনার মূলসূত্রেরও সন্ধান পাওয়া যাবে হিন্দু দর্শনে ও হিন্দু চেতনায়। হিন্দু দর্শনে একটি মূল প্রশ্ন, এক ও বহু, ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে, এবং এক-একটি উত্তর হিন্দু (বা ভারতীয়) দর্শনের এক-একটি শাখা-প্রশাখার জন্ম দিয়েছে। সময়প্রবাহের তাৎপর্য এই উত্তরের মধ্যেই নিহিত।

হিন্দুদর্শনে (এবং বিবেকানন্দ-দর্শনে) ব্রহ্মোপলব্ধি মানবজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য (এর আর-এক অর্থ মানবত্ব ও ঈশ্বরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে, নিজের স্বরূপ সন্ধান)। দ্বৈতবাদীরা বলেন, মানুষ ব্রহ্ম থেকে এসেছে, নিচে নেমে মানুষ হয়েছে, আবার একদিন ব্রহ্মের কাছে ফিরে যাবে। অদ্বৈতবাদ বলে, মানুষই ব্রহ্ম, সেটা উপলব্ধি করতে হবে। পূর্ণ সত্য কালের অতীত, দেশকালনিমিত্তের দ্বারা আবদ্ধ নয়। দেশকালনিমিত্ত এক আবরণ, এই আবরণ খুলে যায় সমাধিস্থ অবস্থায়, সবিচার থেকে নির্বিতর্ক স্তরে মন উত্তীর্ণ হয়। আমরা সময় বলতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে যে পরম্পরা বুঝি, সেই পরম্পরা বা অনুক্রমের রেখা অবশেষে মুছে যায়, থাকে শুধু এক ভাস্বর বর্তমান, উপলব্ধির সেই স্তরে মুহূর্তের পরিসরে অনন্ত কালপ্রবাহকে ধরা যায়[২] (ইংরেজ কবি ব্লেকের দুটি পংক্তি স্মর্তব্য : 'Hold infinity in the palm of your hand / and eternity in an hour')। সেই মুহূর্তের আস্বাদনই যদি পরম সত্য হয়, তবে এই মর্তলোকের সময়চেতনা, দেশকালনিমিত্তের আবরণে আবদ্ধ এই গতিপ্রবাহ কি মায়া, অলীক, অর্থহীন? ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', এবং এক অর্থে ব্রহ্ম ছাড়া সবই মিথ্যা। শংকরাচার্যের মায়াবাদ প্রায় বৌদ্ধ শূন্যবাদে গিয়ে ঠেকেছে, যদিও শংকরাচার্য একথাও বলেছেন যে মায়া সৎ বা অসৎ কোনোটাই নয়, ভাষায় তার বর্ণনা করা যায় না। বিবেকানন্দ শংকরের মায়াবাদ পুরোপুরি মেনে নেননি, তাঁর কাছে মায়ার আপেক্ষিক সত্যতা আছে। 'ইন্দ্র মায়াবলে নানা রূপ পরিগ্রহ করলেন' — এখানে 'মায়া' ম্যাজিকের সঙ্গে সমার্থক, কিন্তু ক্রমে অর্থের রূপান্তর ঘটেছে, এবং বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন[৩] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 'মায়া'-তত্ত্ব এক নতুন গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে :

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥৪।৯
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥৪।১০

ব্রহ্ম মায়াশক্তিতে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে অবিদ্যার বশে জীব-রূপে আবদ্ধ হন। প্রকৃতিকে মায়া বলে এবং পরমেশ্বরকে মায়ার অধীশ্বর (সচ্চিদানন্দ) বলে জানবে। এই নিখিল বিশ্ব যেসব বস্তুতে পূর্ণ, তারা সেই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপে কল্পিত।

আমরা এই জগৎকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছি, আমাদের আর-একটি ইন্দ্রিয় থাকলে আরও কিছু দেখতে পেতাম। যদি আরও একটি ইন্দ্রিয় থাকত এই জগতের অস্তিত্ব আমাদের কাছে অন্যরূপ নিয়ে প্রতিভাত হত। সুতরাং এর কোনো প্রকৃত অর্থ নেই, কোনো অপরিবর্তনীয় অনড় অনন্ত সত্তা নেই। কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে এই জীবন, এই জগৎ পুরোপুরি অলীক। এর অস্তিত্ব আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ।[ক] সুতরাং এই জগতের অস্তিত্ব আছে একথাও বলা যাবে না, আবার অস্তিত্ব নেই তা-ও বলা যাবে না। সৎ-অসৎ মিশ্রিত এই জগতের মধ্যে থেকেই আমাদের কাজ করতে হবে, একে অস্বীকার করা চলবে না।[৪]

হিন্দুদর্শনের মূল সত্যকে বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাকে বিচার করেছেন বাস্তব জীবনের কষ্টিপাথরে, আত্মস্থ করেছেন নিজের অভিজ্ঞতায়। জীবনজিজ্ঞাসা তাঁকে নিয়ে গেছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়, এবং ব্রহ্মোপলব্ধির স্তর থেকে তিনি আবার নেমে এসেছেন বাস্তব পৃথিবীর মাটিতে। যে জীবন আমাদের চোখে প্রত্যক্ষ তা যদি আপেক্ষিক সত্য হয় তবে সময় প্রবাহের তাৎপর্য কী? লৌকিক সময় কি সরলরেখার মতো সামনে এগিয়ে চলেছে, অথবা এর উপমা খুঁজে পাওয়া যাবে জ্যামিতিক চক্রে? আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা যে উদ্বর্তনবাদ ও প্রগতিবাদের কথা বলেছেন, অদ্বৈতবাদের আলোকে কি তা নতুনভাবে দেখা যেতে পারে? এই সব প্রশ্ন বিবেকানন্দ-মানসকে আলোড়িত করেছে, এবং তিনি সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন কঠিন কংকরময় দ্বন্দ্বাকীর্ণ বাস্তব জীবনের সমস্যাবলি নিয়ে। সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ-অশুভের সম্পর্ক কী? পৃথিবীতে সত্যযুগের আবির্ভাব কি সম্ভব? ইতিহাসের ধারায় এমন কোনো পর্যায় কি আসতে পারে যখন অশুভ শক্তি

ক. বিবেকানন্দ বলেছেন, রামকৃষ্ণের শিক্ষা এই যে এক ও বহু দুইই সত্য। (ইংরেজি রচনাবলি, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৬১।)

শুভ শক্তির কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবে, যখন মর্তবাসী স্বর্গের অমৃত আস্বাদন করবে? আর একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন : সময় ও ইতিহাসের সম্পর্ক কী? বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এই সব প্রশ্নের ওপর তীব্র নির্মোহ সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করেছে, মানবপ্রেম থেকে তিনি পৌঁছেছেন সত্যের অমরাবতীতে। যে ঐকান্তিকভাবে জীবনপ্রেমিক, নির্মোহ সত্যের বেদনা তাকেই সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। এই বেদনা বিবেকানন্দের রচনায় আমরা স্পর্শের মতো অনুভব করি। কিন্তু একদিকে যেমন তিনি আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী, আমাদের বেদনার ঘনিষ্ঠ অংশীদার, আর একদিকে তিনি সত্যদ্রষ্টা : আমাদের আনন্দ-বেদনার উর্ধ্বে তাঁর অধিষ্ঠান।

উল্লেখপঞ্জী :

১. মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলি (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৭), অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৭৮।

২. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৪।

৩. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮-৮৯।

৪. তদেব, পৃ. ৯১।

কালচক্র : প্রগতির কুহক

মানবসভ্যতা ধাপে ধাপে উন্নততর স্তরে উঠছে, অশুভশক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং শুভশক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে—এই আধুনিক প্রগতিবাদ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে গ্রহণীয় মনে হয়নি। লৌকিক সময়প্রবাহ তাঁর চোখে চক্রাকৃতি আবর্তন, অগ্রসরমান সরলরেখা নয়, এবং বিভিন্ন ভাষণে এই মত তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি (অনুবাদগুলি পুরোপুরি আক্ষরিক নয়) :

> …কোনো গতিই সরলরেখার মতো নয়। প্রত্যেক গতিই বৃত্তাকার। একটি ঢিল শূন্যে ছুঁড়ে দাও, কোনো বাধা না পেলে সেটি আবার একদিন তোমার হাতেই ফিরে আসবে। সীমাহীনভাবে প্রসারিত সরলরেখা শেষ পর্যন্ত বৃত্তের রূপ নেবে।[১]
>
> গাছ মাটি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, মরে যায়, আবার মাটিকে তার উপাদান ফিরিয়ে দেয়। এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি রূপ পারিপার্শ্বিক পরমাণু থেকে আসে, আবার পরমাণুতেই ফিরে যায়। স্থানভেদে নিয়মের পরিবর্তন হয় না, সর্বত্র একই নিয়ম।… প্রকৃতির এই নিয়ম চিন্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[ক] আমরা যা চিন্তা করি তা মিলিয়ে যায়, আদি উৎসে ফিরে যায়। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের আদি উৎসে ফিরে যেতে হবে, সেই আদি উৎস ঈশ্বর বা পূর্ণ। আমরা সবাই ঈশ্বর থেকে এসেছি,[খ] আমাদের সবাইকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতেই হবে।[২]

সৃষ্টি রহস্য নিয়ে বেদান্তের মত ব্যাখ্যা করে বিবেকানন্দ বলেছেন, বিশ্বের সমস্ত পদার্থ আকাশ থেকে এসেছে ; এবং সমস্ত শক্তি—মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অথবা জীবন—প্রাণ থেকে এসেছে। প্রাণ ও আকাশের সম্মিলনে বিশ্বের সৃষ্টি। একটি কল্পের সূচনায় আকাশ নিশ্চল, অনভিব্যক্ত। তখন প্রাণের কাজ

ক. এই তত্ত্বের একটি নৈতিক দিক আছে। আমরা যদি কাউকে ঘৃণা করি, সে ঘৃণা আমাদের কাছেই ফিরে আসবে। প্রেমও তাই। (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

খ. এটি দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

শুরু, প্রাণ ক্রমশই সক্রিয়, আকাশ থেকে উপাদান নিয়ে স্থূল স্থূলতর রূপ তৈরি করছে : গাছ, প্রাণী, মানুষ, নক্ষত্র। এই বিকাশ ও অভিব্যক্তির ধারা একসময়ে থেমে যায়, সংকোচন আরম্ভ হয়, সবকিছু সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রূপে আকাশ ও প্রাণে ফিরে যায়,[গ] আবার নতুন কল্প আরম্ভ হয়।[৩] একটি কল্পের শেষে বিশ্বে অভিব্যক্ত শক্তি শান্ত হয়ে যায়, সম্ভাব্যরূপে থাকে। নতুন কল্পের আরম্ভে সেই শক্তি আবার কাজ করতে আরম্ভ করে।[৪] এই প্রসঙ্গে স্বামীজি বিভিন্ন ধর্মমতের উল্লেখ করেছেন। পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে, দার্শনিক তত্ত্বে বা কবিতায় সব ধর্মই একথা বলছে যে মানুষ তার আদিরূপ থেকে অধঃপতিত—ইহুদী ধর্মে আছে স্বর্গোদ্যান থেকে আদমের পতনের কাহিনী, হিন্দুধর্মে আছে সত্যযুগের কল্পনা।[৫] পরের যুগ আগের যুগের চেয়ে খারাপ; কলুষ ও আবিলতা ক্রমশ বাড়তে থাকে, অবশেষে আসে প্রলয়। সব ধর্মেই এই প্রলয় বা যুগাবসানের কথা আছে। প্রলয়ের পরে আবার নতুন যুগের, নতুন কল্পের আরম্ভ। আকাশ ও প্রাণের সমবায়ে কল্পের সৃষ্টি; আকাশ সর্বব্যাপী অসীম উপকরণ, প্রাণ সর্বব্যাপী অসীম চৈতন্য। কল্পের শেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণশক্তি বীজ বা অঙ্কুররূপে থাকে। সুতরাং সৃষ্টির আরম্ভ বা অন্ত বলে কিছু নেই, কল্পের আরম্ভ ও অন্ত আছে।[৬] প্রথম কল্প বলে কিছু নেই; গভীর অর্থে সৃষ্টি বলেও কিছু নেই। আছে প্রকাশ। এই জগৎ পরমপুরুষের অভিব্যক্তি।[৭]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শূন্যতা থেকে কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ ছাড়া কিছু হয় না, আর ফল কারণেরই রূপান্তর। একটি কাঁচকে ভেঙে ফেলো, টুকরো টুকরো করে ফেলো, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করো। সেকি শূন্যতায় ফিরে যাবে? না। তার রূপান্তর হবে। আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আর তাকে ধরা যাবে না, কিন্তু তার উপাদান থাকবে। শূন্য থেকে কিছু আসে না, কোনো কিছুই শেষ হয়ে যায় না। সবকিছুই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়, আবার স্থূল থেকে স্থূলতর হয়। সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠে আসে, বাতাসের টানে পাহাড়ের দিকে যায়; এই বাষ্প আবার জলে রূপান্তরিত হয়, শেষে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। বীজ থেকে গাছ হয়। গাছ মরে যায়, শুধু বীজ থাকে। আবার বীজ থেকে গাছ হয়, গাছ থেকে বীজ। সর্বত্র এই একই ধারা। ডিম থেকে পাখি

গ. আকাশ ও প্রাণের উৎস মহৎ বা মহাজাগতিক চৈতন্য। (বিবেকানন্দ রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬০।)

বেরিয়ে আসে, সুন্দর পাখি। সে বড় হয়, আবার তার ডিমের মধ্যে থাকে অন্য এক নতুন পাখির সম্ভাবনা। জন্ম, মৃত্যু, নতুন জন্ম। একই প্রক্রিয়া চলেছে পশুদের মধ্যে, মানুষের জীবনে। সবকিছুই আরম্ভ হয় বীজ থেকে, সূক্ষ্ম আদিরূপ থেকে। বিকাশের অর্থ স্থূলতর রূপ। আবার এই স্থূল রূপ সূক্ষ্মরূপে ফিরে যায়। সমস্ত বিশ্ব এইভাবেই আবর্তিত হচ্ছে। এমন এক সময় আসে যখন এই প্রকাণ্ড সৃষ্টি ছোট হয়ে যায়, অবশেষে মিলিয়ে যায়, ইথারে পরিণত হয়। কিন্তু মৌল উপাদান থেকে যায়, এই মৌল উপাদান থেকে আবার নতুন সৃষ্টি। সংকোচন ও বিকাশের এই ধারাই সৃষ্টির মূল ধারা।[৮] এই প্রসঙ্গে স্বামীজি বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি অভিব্যক্তিবাদ মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মতে অভিব্যক্তিবাদ মানলে সংকোচনবাদও মানতে হবে। অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন, নিম্নতর রূপ থেকে উচ্চতর রূপের সৃষ্টি হয়েছে। এই মত ঠিক, কিন্তু বিকাশের পেছনে আছে সংকোচন, একটি সূক্ষ্ম বীজ যার মধ্যে বিবর্ধনের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। আমরা জানি যে জড়শক্তির বিনাশ নেই এবং সমস্ত বিশ্বে শক্তির পরিমাণ একই, তার কমবেশি হয় না। বৈচিত্র্য শুধু চেহারায়, অভিব্যক্তিতে। বহুর আদি উৎস এক : এক থেকে বহু হয়েছে, এই বহুবিচিত্র বিশ্ব আবার একে মিশে যাচ্ছে, আবার এক থেকে বহু। এই অনন্ত ধারা।[৯] বিবেকানন্দ অভিব্যক্তিবাদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মেনে নেননি। আকাশ ও প্রাণের—উপাদান ও চৈতন্যের—সংশ্লেষে এই সৃষ্টি, কিন্তু প্রাণ ও আকাশের উৎস মহৎ বা অখণ্ড চৈতন্য। অখণ্ড চৈতন্য আকাশ ও প্রাণ সৃষ্টি করেন না, আকাশ ও প্রাণের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, ব্যক্ত হন।[১০] এককে জানাই জ্ঞান। বৈজ্ঞানিকরাও এই এককে জানার চেষ্টা করছেন। এমন একদিন আসতে পারে যখন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌছবেন যে বহুর পেছনে আছে এক।[১১]

এখানে আমরা একটি জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হই। ঈশ্বর মুক্ত, অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি এই বিশ্বে বহুর মধ্যে অভিব্যক্ত হন. তাহলে কি ঈশ্বরের পরিবর্তন হয়? আর অসীম যদি সীমার মধ্যে আবদ্ধ হন, তাহলে কি অসীমের অসীমত্ব খণ্ডিত হয়?[১২] পরিবর্তনীয় হলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। এই প্রশ্নের বৈদান্তিক উত্তর এই যে অপরিবর্তনীয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি, এই সৃষ্টি এই বৈচিত্র্য এই খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বিশ্ব আসলে মায়া, সত্যস্বরূপ নয়। দেশকালনিমিত্তের আবরণ আছে বলে আমরা এই বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি। তার মানে এই নয় যে এই বিশ্বের অস্তিত্ব নেই; এর অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ঠিক সাধারণ অর্থে নয়। রাত্রির অন্ধকারে

গাছের একটি গুঁড়িকে একজন ভাবছে ভূত, পুলিশ ভাবছে চোর, আর একজন ভাবছে তার বন্ধু, যার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। গাছের গুঁড়ির কোনো পরিবর্তন হয়নি, শুধু এক-একজন এক-এক ভাবে তাকে দেখছে। আমাদের বাইরে এক জগৎ আছে, তাকে আমরা জানি না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি রূপই অংশত আমাদের সৃষ্টি, অংশত তা আমাদের বাইরে। বেদান্ত বলছে, এই দুইই আসলে এক। যে শক্তি ফুলের মধ্যে, তা আমাদের চেতনার মধ্যেও রয়েছে, বাইরের জগৎ ও ভেতরের জগতে সত্যিকার কোনো পার্থক্য বা ভেদ নেই। এর অর্থ এই যে, তুমি আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবকিছু সমগ্রের অংশ নয়। যাকে অংশ বলে মনে হচ্ছে আসলে তা সমগ্র, অখণ্ড। আমি পূর্ণ, অখণ্ড। আমার বন্ধন নেই, পরিবর্তন নেই, মৃত্যু নেই, জন্ম নেই। পরিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা বিকাশ আবরণের রকমফের মাত্র, প্রকৃত সত্তার পরিবর্তন নয়।[১৩] এ্যামিবা বা ক্ষুদ্রতম জীবাণু বলে যাকে ভাবছি, আসলে তা অখণ্ড চৈতন্য—এই অখণ্ড চৈতন্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। বুদ্ধকে যদি বিকাশের এক প্রান্ত বলে ধরা যায়, তবে ক্ষুদ্রতম জীবাণুও একই বুদ্ধ। অন্যভাবে বলা যায় যে বুদ্ধের সম্ভাবনা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। প্রত্যেকটি সত্তাই অনন্ত। আমাদের পায়ের নিচে কীটাণু থেকে আরম্ভ করে সন্ত মহাপুরুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের মধ্যেই আছে অনন্ত শক্তি, অসীম পবিত্রতা, সীমাহীনতা। তারতম্য শুধু অভিব্যক্তিতে : কীটাণুর মধ্যে শক্তির প্রকাশ কম, দেবমানবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সকলের মধ্যেই সেই একই শক্তি।[১৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রগতি বলে কিছু নেই, আছে আবর্তন।[ঘ] এক থেকে বহুতে, বহু থেকে আবার একে। সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে। প্রগতিবাদীদের মতে মানবসভ্যতা ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। স্বামীজি মনে করেন, বিকাশের অর্থ স্থূলতা, অর্থাৎ আদি রূপের ক্রমিক অবনয়ন। এই অবনয়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছলে কল্পান্ত। স্বামীজির মতে, এখানে বিজ্ঞান ও হিন্দুদর্শন একই সিদ্ধান্তে পৌঁচচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন তার প্রবক্তা ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাপলাস (১৭৪৯-১৮২৭): নাহারিকার ঘূর্ণন ও সংকোচনের ফলে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে, আবার সব ধ্বংস হয়ে নীহারিকায় পরিণত হবে [১৫] প্রগতিবাদ সম্পর্কে স্বামীজির কয়েকটি উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি :

ঘ. গভীরতর অর্থে, এই আবর্তনও মায়া। পরিবর্তন বলে যা ভাবছি, তা আবরণের পরিবর্তন, অন্তর্নিহিত সত্তার পরিবর্তন নয়।

আজকাল আর একটি তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছে যে মানুষের নিয়তি ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া — মানুষ ক্রমেই উন্নততর হবে, সবসময়ে লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করবে, কিন্তু কখনোই লক্ষ্যে পৌছবে না। আপাতদৃষ্টিতে এই মত বেশ ভালো, কিন্তু আসলে অযৌক্তিক।[১৬]

মানুষের অবস্থা উন্নত অবস্থা, পৃথিবীর কোনো ধর্মই একথা বলছে না। সব ধর্মই একথা বলছে যে আদিতে মানুষ পূর্ণ ও পবিত্র, তারপর তার ক্রমিক অবনমন।[১৭]

প্রকৃতিতে ক্রমিক অগ্রসরণ বলে কিছু নেই...আছে পুনর্বৃত্তি, একই রূপ বার-বার অভিব্যক্ত হচ্ছে।[১৮]

আর একদিক দিয়ে দেখলেও প্রগতিবাদের অযৌক্তিকতা বোঝা যাবে। পৃথিবীতে সবকিছুরই শেষ ধ্বংসে। আমাদের সব চেষ্টা আশা আশঙ্কা আনন্দ — কোথায় তাদের পরিণতি? আমাদের সকলের পরিণাম মৃত্যু। এর চেয়ে নিশ্চিত আর কিছু নেই।[১৯]

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের যুক্তি চারটি। প্রথম, সময়ের গতি সরলরেখার মতো নয়, বৃত্তাকার। দ্বিতীয়, মানবসভ্যতার গতি ক্রমোন্নতির দিকে নয়, ক্রমিক অবনতির দিকে। তৃতীয়, প্রকৃতিতে নতুন কিছু নেই, আছে পুনরাবৃত্তি। চতুর্থ, সৃষ্টির পরিণাম ধ্বংস, সুতরাং সীমাহীন অগ্রগতি বলে কিছু নেই। প্রগতিবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে স্বামীজি শুভ-অশুভের প্রকৃতি নিয়েও আলোচনা করেছেন, সে আলোচনা এই প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান।

উল্লেখপঞ্জী :

১. স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।
২. তদেব, পৃ. ১৯৬-৯৭।
৩. তদেব, পৃ. ৩৫৯-৬০।
৪. তদেব, পৃ. ১৪৮।
৫. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩।
৬. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১৯।
৭. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

৮. তদেব, পৃ. ৪২৫-২৭।

৯. তদেব।

১০. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬০।

১১. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫।

১২. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৮-১৯।

১৩. তদেব, পৃ. ৪২০।

১৪. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৭।

১৫. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

১৬. তদেব, পৃ. ১৯৫-৯৬।

১৭. তদেব, পৃ. ১৯৭।

১৮. তদেব অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

১৯. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

শুভ ও অশুভ : জগৎটা কোঁকড়ানো লেজ

প্রগতিবাদীদের একটি প্রধান যুক্তি এই যে শুভ ও অশুভ শক্তি আলাদা, পরস্পরের বিপরীত। সভ্যতার যত বিকাশ হচ্ছে, অশুভ শক্তি কমে আসছে, শুভ শক্তির পরিমাণ ও প্রাধান্য বেড়ে যাচ্ছে। বিবেকানন্দ এই মত অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে, শুভ ও অশুভ শক্তি আলাদা নয়, পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। এই জগৎ শুভ-অশুভের মিশ্রণ, চিরকালই তাই থাকবে।[১] আমরা পৃথিবীতে সুখের পরিমাণ বাড়াতে পারি না, দুঃখের পরিমাণও বাড়াতে পারি না।[ক] এদিক থেকে ধাক্কা দিয়ে ওদিকে সরিয়ে দিই, ওদিক থেকে ধাক্কা দিয়ে এদিকে সরিয়ে দিই। পরিমাণ একই থাকে, কোনো তারতম্য হয় না। জীবন মানেই মৃত্যু, আনন্দ মানেই দুঃখ। জীবন আর মৃত্যু একই ঢেউয়ের ওঠাপড়া, দুইয়ে মিলে এক।[২] মন্দ ছাড়া ভালো নেই, ভালো ছাড়া মন্দ নেই। খারাপ কিছু নেই, সবই শুভ মঙ্গলময়, এমন অস্তিত্ব, এমন পৃথিবীর কথা ভাবা কল্পনাবিলাস।[৩]

শুভ ও অশুভের স্বাতন্ত্র্য ও মৌল পার্থক্য বিবেকানন্দ অস্বীকার করেছেন। ভালো-মন্দ একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। যেখানে ভালো আছে, সেখানে মন্দও আছে; যেখানে মন্দ আছে, সেখানে ভালোও আছে।[৪] জীবনের পেছনে ছায়ার মতো মৃত্যু। হাসি-কান্নারও একই রূপ। যে কারণে আমরা হাসি, সেই কারণেই আমরা কাঁদি। যে কারণে আমাদের সুখ, সেই একই উৎস থেকে আমাদের দুঃখ। আমাদের অস্তিত্বের মূলে আছে এই আত্ম-বিরোধী সত্য। এই সত্যই জীবনের ধর্ম, এর কোনো ব্যত্যয় নেই। একজন আদিবাসীর কথা ধরা যাক। সে বনে থাকে, লেখাপড়া জানে না, মানসিক সংস্কৃতি থেকে সে বঞ্চিত। কিন্তু আর-একটা দিক আছে। তার শরীরে একটা অস্বাভাবিক শক্তি আছে, সে শক্তি সভ্য মানুষের নেই। গুরুতর আঘাত লাগলেও তার ক্ষত শুকিয়ে যায়, সে সেরে ওঠে। আর সামান্য আঘাতেই আমাদের মৃত্যু হয়, সভ্যতা আমাদের রোগপ্রতিরোধক

ক. একটি ভাষণে (ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৮) বিবেকানন্দ বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় শুভ ও অশুভের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, দুইই বেড়ে যাচ্ছে। স্বামীজি এখানে অনুভবশক্তির তীব্রতার কথা বলেছেন; আমাদের চেতনা তীক্ষ্ণতর হলে সুখবোধ ও দুঃখ-বোধ দুইই বেড়ে যায়। কিন্তু সুখ-দুঃখের অনুপাত ঠিকই থাকে, কম বেশি হয় না।

ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। উৎপাদনব্যবস্থায় যন্ত্রের প্রয়োগে জিনিসপত্র সস্তা হয়েছে, মানবসভ্যতা অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু যন্ত্র পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে, একজন ধনী হয়েছে, আর হাজার হাজার লোক আরও গরীব হয়েছে, ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। এই নিয়মেই সবকিছু চলেছে। যে লোক পশুর কাছাকাছি, তার অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের স্তরে। তার সবকিছু শরীরকে ঘিরে। যথেষ্ট খাবার না পেলে তার কষ্ট, কোনো শারীরিক গোলমাল হলে সে ম্রিয়মাণ। তার সব আনন্দ সব দুঃখ ইন্দ্রিয়ে আরম্ভ, ইন্দ্রিয়ে শেষ। এই মানুষ যখন সভ্যতার পথে পা বাড়ায়, তখন তার সুখের পরিধি বেড়ে যায়, কিন্তু একই অনুপাতে তার দুঃখের পরিধিও বেড়ে যায়। আদিম মানুষ ঈর্ষা কাকে বলে জানে না, আইন-আদালত জানে না, তাকে কর দিতে হয় না, সমাজের ভ্রূকুটি সহ্য করতে হয় না, সামাজিক অনুশাসনের কঠিন চাপে সে রাত-দিন পিষ্ট হয় না। সে জানে না যে সভ্য মানুষ পশুর চেয়েও হাজার গুণ বেশি শয়তান, তার আছে শুধু অসার জ্ঞান আর দম্ভ। আমরা যখন ইন্দ্রিয়ের স্তর থেকে উঁচুতে উঠে আসি, তখন আমাদের উপভোগের ক্ষমতা বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে আমাদের দুঃখ সহ্য করার শক্তিও বেড়ে যায়, আমাদের স্নায়ুতন্ত্রী সূক্ষ্মতর হয়। সাধারণ অশিক্ষিত লোক অপমানের জ্বালা বেশি বোধ করে না। মানসিক আঘাতের চেয়ে শারীরিক আঘাতে তার প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি হয়। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোক একটিও অপমানকর শব্দ সহ্য করতে পারে না, তার সংবেদন এত সূক্ষ্ম ও তীব্র তার আনন্দবোধও যেমন বেশি, কষ্টবোধও তেমনি বেশি। বোধহয় সুখের অনুভূতির তুলনায় দুঃখের অনুভূতির মাত্রা অনেক গুণ বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী দেশ, সেখানে জীবনযাত্রা বিলাসবহুল। কিন্তু সে দেশে সুখের মাত্রা যেমন বেশি, দুঃখের মাত্রাও তেমনি বেশি।[৫] যত বেশি আমরা সভ্য হচ্ছি, আমাদের অনুভবশক্তি ততই বেড়ে যাচ্ছে। সুখ-দুঃখ শুভ-অশুভ নিয়েই এই জগৎ আপাতদৃষ্টিতে তারা আলাদা, কিন্তু আসলে একই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশ।[৬] অবিমিশ্র শুভ অশুভ বলে কিছু নেই।

অনেক সময়ে আমরা ভাবি, পৃথিবী থেকে সমাজ জীবন থেকে যা-কিছু অশুভ ও অকল্যাণকর তা বাদ দিতে পারলেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই ধরনের চিন্তা স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।[৭] এই পৃথিবীতে সব সময়েই ভালো ও মন্দ থাকবে, অশুভ শক্তিকে কখনোই দূর করা যাবে না। এই মর্ত্য জগৎকে চরম ও পরম সত্য ভেবে এগোলে কখনোই স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলা যাবে না। জগৎটা কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের মতো, তাকে সোজা করার

অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কখনোই সে সোজা হয় না।[৮] দেশের প্রত্যেকটি বাড়িতে দাতব্য-আশ্রম বানাতে পারি, সারা দেশ হাসপাতালে ভরে দিতে পারি, তাতে মানুষের সত্যিকার দুঃখ দূর হবে না[৯] এক ধরনের কষ্টের লাঘব করলে আর-এক ধরনের কষ্ট দেখা দেয়; যদি দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয়, তবে দেখা যাবে মানসিক কষ্ট বেড়ে গেছে।[১০] অশিক্ষিত লোক লেখাপড়া শিখলে কবিতা পড়ে আনন্দ পাবে, একটি জটিল অঙ্ক তার বুদ্ধির খোরাক যোগাবে; সেই সঙ্গে তার অনুভবশক্তি, তার মানসিক যন্ত্রণা প্রখরতর হবে।[১১] আদর্শ পৃথিবী — যেখানে দুঃখ নেই, অকল্যাণ নেই, অশুভ শক্তি নেই — কবির কল্পনা, তা কোনোদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে না।

> শুভ ও অশুভ আলাদা, পরস্পরবিরোধী,··· এই দ্বৈতবাদ ঠিক নয়।··· একই জিনিস এক-এক সময়ে সুখ ও দুঃখ দেয়। আবার একজনের কাছে যা সুখ, আরেকজনের কাছে তা দুঃখ। একজন মাংস খেয়ে আনন্দ পাচ্ছে, কিন্তু যে পশুকে কাটা হয়েছে সে কষ্ট পেয়েছে। এমন কোনোদিন পৃথিবীতে আসবে না, যখন শুধু ভালোই থাকবে, মন্দ থাকবে না।[১২]

> দুটো পথ আছে। একটা পথ··· ক্ষণিক দু'এক টুকরো সুখের বিনিময়ে সাব-জীবন কষ্ট সহ্য করা। আর-এক পথ, সুখ দুঃখেরই অন্য রূপ এটা বুঝে সুখের পেছনে না ছোটা, সত্যের সন্ধান করা। আর যাদের সত্যকে খোঁজার সাহস আছে, তারা শেষে উপলব্ধি করে সত্য সবসময়েই রয়েছে, তাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে।[১৩]

পৃথিবীতে ভালোমন্দ চিরকালই থাকবে, অশুভ শক্তিকে কোনোদিনই দূর করা যাবে না, এই নির্মোহ সত্যে যদি আমরা পৌছই, তাহলে কর্মের তাৎপর্য কী? কর্মযোগ বলতে আমরা কী বুঝি? আমরা কি সত্যিই মানুষের কোনো উপকার করতে পারি? বিবেকানন্দ বলেছেন, পরম অর্থে না, আপেক্ষিক অর্থে, হ্যাঁ। আমরা পৃথিবীতে চিরস্থায়ী ভালো কিছুই করতে পারি না। অল্প কিছু সময়ের জন্যে একটি লোকের ক্ষুধার উপশম করা যায়, কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত হবে। আমরা যে সুখের বা আরামের ব্যবস্থাই করি না কেন, তা ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেক যুগেই অনেক লোক মানুষের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা কতটুকু সফল হয়েছেন? এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে নিষ্কামভাবে কাজ করতে হবে। যারা গোঁড়া এবং যারা ভাবে যে তারা অন্যলোকের উপকার করছে, তারাই পৃথিবীর সবচেয়ে

বেশি ক্ষতি করে। আমরা পৃথিবীর ভালো করতে পারি অথবা অন্য লোকের উপকার করতে পারি, এই চিন্তা করা বোকামি। তার মানে এই নয় যে আমরা ভালো কাজ করার চেষ্টা করব না। অবশ্যই করব। ভালো কাজ করার ইচ্ছা মানুষের মহত্তম প্রবণতা ; কিন্তু এই কথা মনে রেখে কাজ করতে হবে যে অন্য লোকের উপকার করার চেষ্টা করে আমরা নিজেরাই গৌরবান্বিত হই। গরীবকে সামান্য কিছু দান করে আত্মশ্লাঘা অনুভব না করে আমাদের ভাবতে হবে যে তাকে সাহায্য করার সুযোগ পাওয়ায় আমরা তার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। দয়া নয়, প্রেম। সহ-মর্মিতা। জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে টাকা-পয়সা দিয়ে লোককে খানিকটা সাহায্য করা যায়, কিন্তু সে সাহায্যের দাম বেশি নয়। দুঃখের মূলীভূত কারণ দূর করার চেষ্টা করলেই মানুষকে সবচেয়ে বড় সাহায্য করা যায়। দুঃখের মূল কারণ অজ্ঞতা। মানুষের অজ্ঞতা দূর করার যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক। কিন্তু তাঁদের প্রেমে বন্ধন নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, প্রত্যাশা নেই, আছে নিরাসক্ত আনন্দ।[১৪]

উল্লেখপঞ্জী ·

১. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পৃ. ৮০।

২. তদেব, পৃ. ১১২।

৩. তদেব, পৃ. ১৯৫।

৪. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৫-৯৭।

৫. তদেব, পৃ. ১৭৯।

৬. তদেব, পৃ. ১৮০।

৭. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

৮. তদেব, পৃ. ৭৯।

৯. তদেব, পৃ. ৫৩।

১০. তদেব, পৃ. ১১১-১২।

১১. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

১২. তদেব, পৃ. ১৭৭-৭৮।

১৩. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮০।

১৪. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১১-১৩ ; ৭৬-৭৭ ; ৫২-৫৩।

শেষ লক্ষ্য : এ পৃথিবী দেবভূমি

প্রগতিবাদীদের সঙ্গে আর এক ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার মৌলিক বিরোধ আছে। প্রগতিবাদীদের মতে, সরলরেখার গতি অন্তহীন। মানবসভ্যতা উন্নতির পথে এগিয়েই চলবে, কোনোদিন শেষ লক্ষ্যে পৌঁছবে না।[১] চরম লক্ষ্য বা পূর্ণতা বলে কিছু নেই, সবই আপেক্ষিক। বিবেকানন্দ এই মত অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে, শুধু মানুষ নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু এক পরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।[২] সেই লক্ষ্য অখণ্ড চৈতন্য, পূর্ণ ব্রহ্ম।

এখানে দ্বৈতবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের পার্থক্য আছে। দ্বৈতবাদে এক ও বহুর, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ব্যবধান স্বীকার করা হয়েছে। এই ব্যবধান একদিন মুছে যাবে, জগৎ আবার ব্রহ্মে লীন হবে (এখানেই বৃত্ত চিত্রকল্পের যাথার্থ্য)। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ব্যবধান শুধু অজ্ঞতার আবরণ : আমি জানি না যে আমি পূর্ণ চৈতন্য। সুতরাং ব্রহ্মের কাছে ফিরে যাওয়ার আসল অর্থ নিজের স্বরূপকে চেনা। এক সিংহশাবক ভেড়ার মধ্যে বেড়ে উঠেছিল। তার ধারণা ছিল সে ভেড়া, ভেড়ার মতোই সে ছিল ভীরু, ভেড়ার মতোই ব্যা-ব্যা করে চেঁচাত। অবশেষে একদিন সে বুঝতে পারল, সে ভেড়া নয়, সিংহ। সঙ্গে সঙ্গে তার চালচলন, কণ্ঠস্বর সবই পাল্টে গেল। মানুষ জানে না সে পূর্ণ, পবিত্র, অনন্ত আত্মা। তাকে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করতে হবে, বলতে হবে, 'আমিই সে'।[৩] সুতরাং প্রকৃত অর্থে চৈতন্যের বিকাশ নেই, উদ্‌বর্তন নেই, শুধু আছে সত্যস্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস। ধরা যাক, আমার ও তোমাদের মধ্যে একটা পর্দা আছে ; পর্দার মধ্যে একটা ছোট ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়ে আমি কয়েকটা মুখ দেখতে পাচ্ছি। শুধু কয়েকটা মুখ। ধরো সেই ছিদ্রটা ক্রমশ বড় হচ্ছে, আমার সামনের দৃশ্য আমি ক্রমেই বেশি করে দেখছি। অবশেষে পর্দাটা আর থাকল না, আমাদের মধ্যে আড়াল আর কিছু রইল না। তোমাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি ; শুধু ছিদ্রটা বেড়ে গেছে, তোমরা আমার সামনে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছ। একইভাবে চৈতন্যেরও কোনো পরিবর্তন হয় না। সেই অর্থে পূর্ণতার দিকে যাত্রা বলে কিছু নেই, সবাই মুক্ত, পূর্ণ।[৪]

২

বিবেকানন্দ একদিকে বলেছেন, আদর্শ সমাজ কল্পনাবিলাস মাত্র, ভালোমন্দ চিরকালই থাকবে, অবিমিশ্র ভালো বলে কিছু নেই। আবার তিনি বিভিন্ন ভাষণে ও চিঠিতে সত্যযুগের কথা বলেছেন, আদর্শ পৃথিবীর কথা বলেছেন।[৫] এই দুই মতের মধ্যে বিরোধ কিছু নেই। আমরা যদি জড়বাদী দর্শন মানি, এই জগৎকেই পরম সত্য বলে মনে করি, তবে সুখ-দুঃখের বৃত্ত থেকে কোনোদিন মুক্তি পাব না। সুখের পেছনে আসবে দুঃখ, জীবনের পেছনে মৃত্যু। কিন্তু যদি সুখ-দুঃখের, জীবনমৃত্যুর আবরণ ভেদ করে সত্যের সন্ধান পাই, পূর্ণকে আবিষ্কার করি, তবে আর অশুভ অকল্যাণ বলে কিছু থাকবে না। বিবেকানন্দ এক ভাষণে বলেছেন, সামগ্রিকভাবে প্রগতি বলে কিছু না থাকলেও আত্মার প্রগতি আছে।[৬] অর্থাৎ মানুষ তার স্বরূপের কাছাকাছি পৌঁছয়, প্রত্যেক কল্পে অনেক আত্মা চক্রের আবর্ত থেকে মুক্তি পায়।[ক] কিন্তু এই আবর্তনই সৃষ্টির শেষ কথা নয়। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমরা দেখতে পাই মায়ার আবরণ থেকে মুক্তির প্রয়াস, জগতের চরম ও পরম লক্ষ্য এই মুক্তি।[৭]

প্রত্যেকটি মানুষ তার শৈশবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে আসে। আদিম স্তর থেকে সভ্যতার বর্তমান স্তরে পৌছতে তার পূর্বপুরুষদের কয়েক হাজার বছর লেগেছিল, আজকের শিশু কয়েক বছরে উত্তরণের সেই স্তরে পৌঁছয়। প্রথম স্তরে সে হিংস্রতায় আদিম অসভ্য মানুষের মতো—পায়ের নিচে প্রজাপতিকে নিষ্ঠুরভাবে পিষে মারে। তারপর তার অগ্রগতি দ্রুত। মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীসমেত সমগ্র প্রকৃতির প্রগতির ধারা এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, সে লক্ষ্য পূর্ণতা।[৮] সবাই সে পথে সহযাত্রী : অণু-পরমাণু, গাছ, পশু, মানুষ। ভালো লোক, মন্দ লোক। সবাই চলেছি মুক্তির পথে। সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্রেম, সেই প্রেমের শক্তি আমাদের টানছে।[৯] কেউ যাচ্ছি অচেতনভাবে, কেউ সচেতনভাবে। যারা সচেতন তারা এই উত্তরণকে ত্বরান্বিত করবে, এই উত্তরণকে ত্বরান্বিত করাই মানুষের সাধনা।[১০] চৈতন্যের জাগরণ চাই, মানুষের মধ্যে নিহিত ব্রহ্মের উপলব্ধি চাই, তবেই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।[১১] স্বামীজি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে এমন সময় আসবে যখন মানুষের স্বার্থবোধ পুরোপুরি চলে যাবে।[১২] ভালো মন্দ, শুভ অশুভ সবই আপেক্ষিক,

ক. স্বামীজি এই প্রসঙ্গে মহামানব বা অবতারদের কথা উল্লেখ করেছেন. এমন এক এক জন মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেন যাঁদের মধ্যে বিকাশের, উত্তরণের ধারা সংহত, যাঁরা এক জীবনেই পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করেন। (ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯)।

আত্মার সীমাবদ্ধ প্রকাশ। অশুভশক্তি শুধু বাইরের আবরণ, শুভশক্তি সত্যস্বরূপের কাছাকাছি।[১৩] ভালোমন্দের আবরণ ভেদ করে যে সত্যকে পেয়েছে, তার কাছে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম। পৃথিবী আর তার কাছে কারাগার নয়, সমগ্র সৃষ্টি তার কাছে অপরূপ, প্রেমময়। প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, এই বোধ যার হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত, তার চোখে অশুভ বলে কিছু নেই। যদি সমস্ত মানুষ এই স্তরে পৌঁছতে পারে, তাহলে আর অশুভশক্তি বলে কিছু থাকবে না, ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসার স্থান নেবে প্রেম। পৃথিবী তখন দেবভূমি হবে।[১৪]

উল্লেখপঞ্জী :

১. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পৃ. ১৯৫-৯৬।

২. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০২।

৩. তদেব, পৃ. ৮৬-৮৭।

৪. তদেব, পৃ. ৮১।

৫. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫, ৪২১ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩১।

৬. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

৭. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৩, ১২৫-২৭।

৮. তদেব, পৃ. ১৮।

৯. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২১-২২ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

১০. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯।

১১. তদেব, পৃ. ২৮৬-৮৭।

১২. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫।

১৩. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

১৪. তদেব, পৃ. ২৮৬-৮৭।

চেতনার সিঁড়ি

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের আলোচনায় বিশেষ সতর্কভাবে এগোনো দরকার। তাঁর কোনো মত বা উক্তি বিশেষ প্রসঙ্গ থেকে আলাদা করে দেখলে ভুল বোঝার, ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে। সময়ের গতি ও শুভ-অশুভের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বামীজির মতামত পর্যালোচনা করে আমরা যা পেয়েছি তা মোটামুটিভাবে তাঁর অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কিন্তু লৌকিক সময়-প্রবাহ, ইতিহাসের গতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে যেসব মন্তব্য করেছেন, সেগুলি বিচার করলে দেখা যায়, তিনি পৃথিবীর মাটির কাছাকাছি এসেছেন, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের আনন্দবেদনার অংশ নিয়ে সামাজিক ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণ করছেন : সেখানে তিনি মানবতাবাদী, যদিও অদ্বৈতবাদ তাঁর মানবতাবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি এক এক সময়ে এক এক স্তরে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন ; এক স্তরে দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছেন অন্য স্তরে তা পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে না। তাঁর বিভিন্ন উক্তি বিশ্লেষণের আগে সত্যের এই আপেক্ষিকতা মনে রাখতে হবে।[ক] শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'নেতি নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন, ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ। তখন বোধ হয় জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্ম বলা হয়, অবস্তু বলা হয়। বিচারের সময় বেলের শাঁসকে সার, খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়।[১] আবার বলেছেন, ঈশ্বর নানা ধর্ম নানা মত করেছেন, অধিকারী বিশেষের জন্যে। সকলে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই সাকার পুজোর ব্যবস্থা। অধিকারিভেদ, রুচিভেদ, যার যা পেটে সয়। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা সেই মাছের ঝোল অম্বল ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই কারও কারও জন্যে মাছের ঝোল করেছেন, তারা পেটরোগা। আবার কারও সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা, অধিকারভেদে ব্যবস্থাও আলাদা।[২] স্বামীজি এক শিষ্যের কাছে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন, বেদান্ত দর্শনের তিনটি স্তর

ক. যাঁরা পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদের সঙ্গে কোনো আপোষ করতে রাজি নন, তাঁরা এই আপেক্ষিকতাবাদ নাও মানতে পারেন।

আছে : দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত। একটির পর একটি। প্রত্যেকটি স্তরেরই দরকার আছে। বিভিন্ন জাতির প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী এক এক ধর্মমত গড়ে উঠেছে।[৩] সত্যের এই আপেক্ষিকতা প্রসঙ্গে স্বামীজির দুটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে :

> শিষ্য। ···আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কি আবার ঐ সকল বাহ্য লোকব্যবহারকে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে ?
>
> স্বামীজি। কেন পারবে না ? সত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তাও তো relative (আপেক্ষিক)—দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে। ঠাকুর যেমন বলতেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও কালিয়া রেঁধে দেন, কোন ছেলেকে বা সাগুপথ্য দেন, সেইরূপ।
>
> ('স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৫)

> শিষ্য। তবে কি মহাশয়, মূর্খ ও বুদ্ধিমানের ধর্ম আলাদা ?
>
> স্বামীজি। তাই তো, নইলে তোর শাস্ত্রেই বা এত অধিকারি-নির্দেশের হাঙ্গামা কেন ?[খ] সবই truth (সত্য), তবে relative truth, different in degrees (আপেক্ষিক সত্যে তারতম্য আছে)। মানুষ যা কিছু সত্য ব'লে জানে, সে সকলই ঐরূপ ; কোনটি অল্প সত্য, কোনটি তার চেয়ে অধিক সত্য, নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান।
>
> (তদেব, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৬)

বিভিন্ন ভাষণে ও চিঠিপত্রে স্বামীজি এই আপেক্ষিকতাতত্ত্ব প্রচার করেছেন। আমরা অনেক সময়ে ভাবি যে পূর্ণতার লক্ষ্যে যাত্রায় মানুষ ভ্রান্তি থেকে সত্যে পৌঁছয়, এক স্তর থেকে আর এক স্তরে যাবার পথে আগের স্তরকে বর্জন করে এগিয়ে যায়। স্বামীজির মতে এই ধারণা ঠিক নয়। ভ্রান্তি থেকে কেউ সত্যে পৌঁছতে পারে না। মানুষ সত্যের আর এক ধাপে এগিয়ে যায়, নিচু ধাপ থেকে উঁচু ধাপে। প্রত্যেকটি ধাপই সত্য, শুধু স্তরের তারতম্য। ধরা যাক, একটি লোক সূর্যের দিকে যাত্রা করেছে, প্রত্যেক পদক্ষেপে সে ছবি তুলছে। প্রত্যেকটি ছবিই আলাদা হবে,

খ. অন্যত্র স্বামীজি এই অধিকারিভেদ তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা এই তত্ত্ব উপেক্ষা করেছে, এই তত্ত্বের মূল উৎস স্বার্থপরতা। (ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৬২-৬৩)।

প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি আলাদা, তারপর যখন সে সূর্যে পৌঁছবে সে ছবি তো একেবারেই অন্যরকম হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি ছবিরই আপেক্ষিক সত্যতা আছে, যদিও দেশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। এটা উপলব্ধি করলে আমরা বুঝব যে, সব ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে, প্রভেদ শুধু স্তরে।[৫] আমাদের শিক্ষা, বুদ্ধি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা সত্যকে দেখছি, বিচার করছি, এক একজনের কাছে সত্য এক এক ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই মানুষে মানুষে পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য। কিন্তু এই সব পার্থক্য সত্ত্বেও একই সর্বজনীন সত্য সকলের মধ্যে রয়েছে।[৫] প্রত্যেক ধর্মেই নিচু স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তরণের ইঙ্গিত আছে। যারা শয়তানকে পূজো করে, তারাও বিকৃতভাবে ধ্রুব অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মেরই সাধনা করছে।[৬] সত্য এক, যদিও আপেক্ষিক সত্যের রূপ আলাদা।[৭]

স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ মানসিক কাঠামো ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটা যোগসূত্র আছে। তিনি বলেছেন, ভারতের মানুষের মঙ্গলকামনা তাঁর জীবনের ব্রত। দেশের অবস্থা দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, সমাধি তুচ্ছ বোধ হয়, 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং' হয়ে যায়।[৮] এই বেদনাবোধই তাঁকে টেনে এনেছে আমাদের জীবনের সীমানায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে, শুকদেবের মতো মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।[৯] তবু এই অদ্বৈতবাদী জ্ঞানযোগী পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছেন, জরাব্যাধিমৃত্যুক্লিষ্ট দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। তিনি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, অথচ মানবপ্রেমিক, সমাজ-সংস্কারক, ইতিহাস-সচেতন সমাজবিপ্লবী। তাঁর ভাষায় সংগীতের মূর্ছনার মতো অনেক ক্রম, অনেক ঢেউয়ের ওঠাপড়া। তিনি কর্মফল ও পূর্বার্জিত সংস্কারে বিশ্বাস করতেন, মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে তার কর্মের কার্যকারণ সম্পর্ক আছে একথা অনেক জায়গায় বলেছেন।[১০] কিন্তু 'কর্মফলে মানুষ মরছে—সুতরাং দুর্ভিক্ষে সাহায্য করার দরকার নেই', গোরক্ষণী সভার প্রচারকের এই যুক্তি শুনে ক্ষোভে দুঃখে তাঁর মুখ আরক্তিম হয়েছে, চোখের কোণে অগ্নিকণা স্ফুরিত হয়েছে। স্বামীজি পরে বলেছেন :

> বলে কিনা—কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া ক'রে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায়

গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি ?গ মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ ?
এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজির সর্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে দুঃখে শিহরিয়া উঠিল।

(তদেব, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০)

য়ুরোপ-আমেরিকায় স্বামীজি বিশেষভাবে বলেছেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা, প্রচার করেছেন আত্মদর্শনের তত্ত্ব, অদ্বৈতবাদ। ভারতবর্ষে ফিরে তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন সমাজ সংস্কারের ওপর, ঐহিক উন্নতির ওপর, সত্ত্বগুণের চেয়ে রজোগুণের ওপর :

…দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল।… অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস-পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় ? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে ? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ? …ভারতে রজোগুণের একান্ত অভাব ; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

('ভাব্‌বার কথা', চতুর্দশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪)

…ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না ; একটা দারুণ অভাব বোধ করছে। তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা

গ. স্বামীজি কর্মফলের কথা বলেছেন। কিন্তু নিয়তিবাদ অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে কর্মবাদ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিরোধী নয়। কর্মবাদ এই তত্ত্বই ঘোষণা করছে যে, মানুষ সর্বতোভাবে স্বাধীন, নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা তার আছে। (ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৫ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১৩-১৪)।

কতকটা তৃপ্ত হ'লে তবে লোকে যোগের কথা শোনে[ঘ] ও বোঝে ; অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন ; রোগ শোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার-ফেক-চার দিয়ে কি হবে ?···ধর্মকথা শোনাতে হ'লে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে।

('স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃষ্ঠা ১৩৩)

···আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর্—জীবন সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তারপর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল···একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকার উঠেছে !···পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্···ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ তৎপর হতে উপদেশ দিই।··ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হ'লে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না।

(তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৪-৬৫)

—এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যেসব লোককে এখন সত্ত্বগুণী ব'লে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের ! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা। দেশ যে ঘোর তমাসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিস না ?

(তদেব, পৃষ্ঠা ১৫২)

শুধু সেকেলে পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে ? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তর্‌তর্ ক'রে এখন দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। তার উপ-যোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না ক'রে কেবল পাহাড়ে বসে ধ্যানস্থ থাকলে এখন আর কি চলে ?

(তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৭)

ঘ. অন্যত্র স্বামীজি বলেছেন যে ভোগ থেকে ত্যাগ হয় না, ভোগের সাধ কখনও মেটে না। বৈরাগ্য, ত্যাগই একমাত্র পথ। ('স্বামী-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৪৪, ১৪০, ১৪২, ১৪৭)। এখানেও স্তর-ভেদের কথা ভাবতে হবে। চেতনার স্তর অনুযায়ী এক এক জনের এক এক পথ।

…এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি ? নতুবা গেরুয়া প'রে আর কি হ'ল ? 'পরহিতায়' সর্বস্ব-অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস।…দেশের লোকেরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো ঘণ্টানাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা… আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তা ছাড়া ঈশ্বব-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

(তদেব, পৃষ্ঠা ২৩৫-৩৭)

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ম্যাক্সমুলর-প্রণীত সংস্করণ আনা হয়েছে, শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজির কাছে সায়নভাষ্য পড়ছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করতে সায়ন যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন স্বামীজি তার ব্যাখ্যা করে কখনও ভাষ্যকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন, আবার কখনও কোন পদের গূঢ়ার্থ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করে সায়নের যুক্তি খণ্ডন করছেন। আলোচনা ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করেছে, এমন সময়ে নাট্যকার ও কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেখানে উপস্থিত হলেন। স্বামীজির অপূর্ব বেদব্যাখ্যা কিছুক্ষণ শোনার পরে গিরিশবাবু বলে উঠলেন, হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে ?' গিরিশবাবুর কথা শুনে মানুষের দুঃখকষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে স্বামীজির চোখে জল এল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনের ভাব গোপন করার জন্যে বাইরে চলে গেলেন। গিরিশবাবু বললেন, 'স্বামীজি অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যেই জগতের দুঃখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদ-বেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ ক'রে থাকেন তো অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।' স্বামীজি পরে ফিবে এসে বললেন, 'এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারো জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে ? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে।'[১১] স্বামী যোগানন্দ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছেন, 'নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্ম-

জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে।'[১২] কখনও তিনি জ্ঞানমার্গের কথা বলেছেন, কখনও ব্যাখ্যা করেছেন ভক্তিমার্গের তত্ত্ব, কখনও প্রচার করেছেন নিষ্কাম কর্মবাদ। আবার ভারতের মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য দেখে তিনি লৌকিক জীবনের স্তরে দাঁড়িয়ে সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন, রজোগুণ-উদ্দীপিত ঐহিক কর্মের আহ্বান জানিয়েছেন :

·· মহারজোগুণসম্পন্ন তারা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। তাদের যোগ হবে না তো কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের হবে? ···এখন মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত ক'রে কর্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম—কর্ম—কর্ম। এখন 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—এ ছাড়া উদ্ধারের আর অন্য পথ নেই।

(তদেব, পৃষ্ঠা ১৭)

স্বামীজি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লোকের কাছে নানা রকমের উপদেশ দিয়েছেন ও তত্ত্ব প্রচার করেছেন। তাঁর এই সব উক্তির মধ্যে আপাত-বিরোধিতা থাকতে পারে, কিন্তু গভীরতর অর্থে কোন বিরোধ নেই। সত্য এক, অনড়, অপরিবর্তনীয়। তবু দেশকালভেদে স্তরভেদে সত্যের রূপ পাল্টায় এ কথা স্বামীজি বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন :

শিষ্য। তাহা হইলে এই সকল ব্যবহারিক সত্তা কি সত্য নহে?
স্বামীজি। যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই 'আমি আত্মা'—এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে 'পাপ পাপ' বলে, সেটা weakness (দুর্বলতা)-এর ফলে—'আমি দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা'—এইভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যাবি।

(তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩)

শিষ্য। ···নানালোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরীশবাবু) বলিলেন, 'কি হবে ও সব পড়ে?' আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি?
স্বামীজি। আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই standpoint (দিক) থেকে আমাদের দুজনের কথাগুলি বলা হচ্ছে—এই পর্যন্ত। একটা অবস্থা

আছে, যেখানে যুক্তিতর্ক সব চুপ হয়ে যায় – 'মূকাস্বাদনবৎ'। আর একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা পঠনপাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়।

(তদেব, পৃষ্ঠা ৪০)

স্বামীজি একজনকে উপদেশ দিয়েছিলেন (হয়ত পরিহাসের ছলে), মিথ্যে কথা বলতে। নিষ্ক্রিয় অসাড় জড়ভরত অবস্থার চেয়ে মিথ্যেবাদী হওয়াও ভালো।[১৩] তার মানে এই নয় যে সবাইকে মিথ্যে কথা বলতে হবে। এমনি অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। স্বামীজি বলেছেন, শুভ-অশুভ দুই-ই মায়া, অজ্ঞানতার আবরণ (যদিও শুভশক্তি সত্যস্বরূপের কাছাকাছি)। একথাও বলেছেন যে পৃথিবীতে শুভ-অশুভ দুই-ই চিরকাল থাকবে, শুভ-অশুভের অনুপাতের কোন মৌলিক তারতম্য হবে না। কিন্তু এক মার্কিন মহিলাকে লেখা একটি চিঠিতে (১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৬) তিনি বলেছেন, অজ্ঞানতা ও অশুভশক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের একথা বুঝতে হবে যে শুভশক্তির বিকাশের দ্বারাই অশুভশক্তি বিনষ্ট হয়।[১৪] এ-উক্তিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যা : আমাদের আত্মিক শক্তির বিকাশ চাই, অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের উপলব্ধি চাই। তবেই অজ্ঞতার আবরণ সরে যাবে, অশুভশক্তি বলে আর কিছু থাকবে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : পরম অর্থে অশুভশক্তি বলে কিছু না থাকলেও লৌকিক স্তরে শুভ-অশুভ দুই-ই সত্য, এবং অশুভশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, অশুভ-শক্তিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা মানুষের কর্তব্য। হয়ত দুটো ব্যাখ্যাই স্বামীজির মনে ছিল। স্বামীজিকে বলা হয়েছে 'বীর সন্ন্যাসী', তিনি সমস্ত জীবন নির্ভীকতার বাণী, শক্তির বাণীও প্রচার করেছেন, অভিরভীরভাঃ।[১৫] 'মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।[১৬] 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'[১৭] (হে অর্জুন, ক্লীবভাব আশ্রয় ক'রো না।) উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।[১৮] নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো।[১৯] ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে।

৬. ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বামীজি শক্তি সাধনার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন. 'বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতা— সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পুজা চালা, শক্তিপূজা চালা।' ('স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১৪৫)। কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে শক্তিসাধনা পশ্চিমী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, আর প্রাচ্যের সাধনা দুঃখবরণ, দুঃখের তপস্যা। প্রাচ্যের এই আদর্শের মূর্ত প্রতীক সর্বংসহা সীতা। (ইংরেজি রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬।) 'শান্ত হিন্দু' কথাটি নিন্দা-সূচক নয়, ভারতের আত্মার মর্মবাণী। (ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৫।)

ডমরু শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে।[২০] দুর্বলতাই মৃত্যু।[২১] স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ সপ্তম সর্গ। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমানা, রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প :

যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !

'"যা হবার হোক গে ; আমার কর্তব্য আমি ভুলব না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক"—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।'[২২] এই একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বামীজি শয়তানের চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। অল্প বয়সে তিনি মিল্টনের মহাকাব্য ('প্যারাডাইজ্ লস্ট') পড়েছিলেন, তখন সবচেয়ে তাঁকে আকর্ষণ করেছিল শয়তানের ব্যক্তিত্ব, তার অনমনীয় দার্ঢ্য, সবরকম প্রতিকূল অবস্থা ও বিপদের মুখোমুখি হবার সাহস। স্বামীজি বলেছেন, একটাই পাপ আছে, সেটা দুর্বলতা।[২৩] কিন্তু শয়তানের চরিত্র সম্পর্কে এটাই তাঁর শেষকথা মনে করলে ভুল হবে। সিঁড়ির এক ধাপে দাঁড়িয়ে তিনি শয়তানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, অন্য ধাপে দাঁড়িয়ে তিনি শয়তানের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন।[২৪] অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে শয়তান বলে কিছু নেই। আছে অজ্ঞতার আবরণ। এই প্রসঙ্গে কর্ম ও জ্ঞান সম্পর্কে স্বামীজির মতের উল্লেখ করা যেতে পারে। এক স্তরে কর্ম জ্ঞানের পরিপন্থী, আর এক স্তরে, আপেক্ষিক অর্থে, কর্ম জ্ঞানের সহায়ক :

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম জ্ঞানের পরিপন্থী—জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে ?

স্বামীজি। আচার্য শঙ্কর ঐরূপ ব'লে আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী ও সত্ত্বশুদ্ধির উপায় ব'লে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া-কর্তা ও কর্মবোধ যতকাল মানুষের থাকবে, ততকাল সাধ্য কি—সে কাজ না ক'রে বসে থাকে ? অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন

> যে-সব কর্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন ক'রে যা না? কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ কথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন কর্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা করবি, তাই সৎকর্ম হবে; তাতে জীবের—জগতের কল্যাণ হবে। তখন আর plan এঁটে কর্ম করতে হবে না।[২৫]
>
> (তদেব, পৃষ্ঠা ২০৬-০৭)

চেতনার সিঁড়িতে উঁচুনিচু অনেক থাক। এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জীবনকে, সত্যকে এক এক ভাবে দেখা যায়। সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের আলোচনা প্রসঙ্গেও স্বামীজি এই স্তরভেদের কথা বলেছেন।[২৬] এক এক দেশে নীতিবোধের মাপকাঠি এক এক রকম। এক দেশে যা নীতিসম্মত অন্য দেশে তা অন্যায়, নীতি-বহির্ভূত। এক দেশে জ্ঞাতিভাই জ্ঞাতিবোনের বিয়ে প্রচলিত, অন্য দেশে এ ধরনের বিয়ে নীতিবিগর্হিত। এক দেশে পুরুষরা ভাইয়ের বৌকে বিয়ে করতে পারে, অন্য দেশে সেটা খুবই খারাপ। এক দেশে একবিবাহ প্রথা, অন্য দেশে বহুবিবাহপ্রথা। এমনিভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও নৈতিকতার মানদণ্ড পাল্টে যায়, যদিও সর্বজনীন সত্য ও নীতিবোধের একটা রূপও আমাদের মনে আছে—যা ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, দেশ-কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। কর্তব্য সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। এক দেশে যা করণীয়, অন্য দেশে সেই কাজই অত্যন্ত গর্হিত, যদিও কর্তব্যের একটা সামান্য অব্যতিক্রমী চেহারাও লোকের মনে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা ভাবে সত্যে পৌঁছবার একটাই পথ। আর সব পথ ভুল। যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরা জানেন যে আমাদের মানসিক কাঠামো, আমাদের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক স্তর অনুযায়ী আমাদের কর্তব্যবোধ ও ন্যায় অন্যায়ের ধারণা গড়ে ওঠে। এখানে স্বামীজি একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মহাপুরুষেরা বলে গেছেন, অন্যায়ের, অশুভশক্তির প্রতিরোধ ক'রো না। অপ্রতিরোধী অহিংসা সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। কিন্তু আমরা জানি যে এই নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করলে সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়বে, দুষ্ট লোকেরা আমাদের সম্পত্তি গ্রাস করবে, বেঁচে থাকা কঠিন হবে, দুর্জনেরা আমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে। মনের গভীরতম লোকে এই পরম বোধিতে আমরা পৌঁছই যে অপ্রতিরোধের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। কিন্তু এটাও ঠিক যে এই নীতি লৌকিক স্তরে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। যে অন্যায়ের

প্রতিরোধ করছে তার নিজস্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী সে ঠিক কাজই করছে, বিশেষ অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই তার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।চ এর আর একটা দিকও আছে। একজন অন্যায়ের প্রতিরোধ করছে না, অন্যায়কে মেনে নিচ্ছে, কারণ সে দুর্বল, অলস, অশক্ত। আর একজন প্রবল শক্তির অধিকারী, অন্যায়কারীকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু সে শুধু যে প্রত্যাঘাত করছে না তাই নয়, শত্রুকে আশীর্বাদ করছে। দুর্বলের অহিংসা পাপ, আবার সবলের পক্ষে প্রতিরোধই পাপ। অর্জুন আত্মীয় ও জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান নি, 'গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাকে ক্লীব ও কাপুরুষ বলে ভর্ৎসনা করেছেন (ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। / ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥')। দুর্বলতা থেকে যে অহিংসা, তা খাটি নয়। বুদ্ধ সিংহাসন ও রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে ভিক্ষুব্রত নিয়েছিলেন, সেটাই আসল ত্যাগ। ভিক্ষুকের কি আছে যে সে ত্যাগ করবে ? আমরা যখন প্রেম, অহিংসা, অপ্রতি-রোধের কথা বলি, তখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে প্রতিরোধের ক্ষমতা আমাদের আছে কিনা। নিজেকে বঞ্চনা করে কোন লাভ নেই, আত্ম-প্রবঞ্চনার পথে প্রেমের শক্তি অর্জন করা যায় না। স্বামীজি বলেছেন, প্রতিপক্ষের বিশাল বাহিনী দেখে অর্জুন ভয় পেয়েছিলেন, নিজের কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের ভর্ৎসনা।ছ প্রকৃত কর্মযোগী জানেন যে অহিংসা ও অপ্রতিরোধই চরম ও পরম আদর্শ। তিনি আরও জানেন যে এই অপ্রতিরোধ বীরের অস্ত্র, শক্তির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ এই পরম লক্ষ্যে পৌছবার পথে আবশ্যক পদক্ষেপ। এই পরম লক্ষ্যে পৌছবার আগে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা মানুষের কর্তব্য। কর্মের পথে, সংগ্রামের পথে আগে তাকে শক্তি অর্জন করতে হবে, একমাত্র তখনই সে শেষ লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারবে। সব লোকের ক্ষমতা এক নয়, আর তাই সকলের চলার পথ এক হতে পারে না। এই স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য স্বীকার করে নিতে হবে।

চ. বিবেকানন্দ বলেছেন, 'অহিংসা ঠিক, "নির্বৈর বড় কথা"··কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে···।' '··ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক-ভোগ, পরকালেও তাই। এই শাস্ত্রের মত। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', ৯ ১০।)

ছ. অর্জুনের বিষাদের কারণ সম্পর্কে স্বামীজির এই ব্যাখ্যা আমরা নাও মানতে পারি, আত্মীয়বিরোধের কঠিন পরিস্থিতিতে অর্জুনের সংশয় ও হতাশার উৎস অনেক গভীরে। কিন্তু স্বামীজির মূল বক্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই।

উল্লেখপঞ্জী :

১. ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ (কথামৃত ভবন), প্রথম ভাগ (১৩৭০), পৃ. ১২২-২৩।

২. তদেব, তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৯০।

৩. স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২।

৪. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।

৫. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

৬. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২০২।

৭. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪।

৮. ‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদ’, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৫৯।

৯. তদেব, পৃ. ৫৯।

১০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৫-৪৬, ২৯৩, ৩২০ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪২, ২৬৮-৬৯, ২৭০-৭১, ৩৫৫-৫৬ ; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৫।

১১. ‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদ’, পৃ. ৩৪-৪১।

১২. তদেব, পৃ. ৫৯।

১৩. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০।

১৪. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

১৫. ‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদ’, পৃ. ১৪১।

১৬. ‘বর্তমান ভারত’, ১৮শ সংস্করণ, পৃ. ৫৪।

১৭. ‘গীতা’, দ্বিতীয় অধ্যায় ; ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,’ ষষ্ঠবিংশ সংস্করণ, পৃ. ১৩।

১৮. ‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদ’, পৃ. ৪৯।

১৯. তদেব, পৃ. ১২৩।

২০. তদেব, পৃ. ৫১, ২১৯।

২১. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩।

২২. ‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদ’, পৃ. ২১২।

২৩. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯।

২৪. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৭ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১২৬, ১২৯-৩১।

২৫. ‘স্বামি-শিষ্য সংবাদ’, পৃ. ১৬০-৬৫ পৃষ্ঠাতেও এই প্রসঙ্গে আলোচনা আছে।

২৬. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬-৪১।

জড়বাদ, রূপান্তর, প্রগতি

এক স্তরে দাঁড়িয়ে স্বামীজি প্রগতিবাদকে বর্জন করেছেন, আদর্শ সমাজের স্বপ্নকে বলেছেন কল্পনাবিলাস। আর এক স্তরে দাঁড়িয়ে তিনি ঐহিক প্রগতিকে আবাহন করেছেন, আদর্শ সমাজ গঠনের কাজে তরুণদের, বিশেষভাবে ভারতের তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিদেশ থেকে ফিরে এক ভাষণে তিনি বলেছেন, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ভারতের প্রাণশক্তি, তবু সন্ন্যাসীর জীবন আর সাধারণ মানুষের জীবন এক নয়, এক মাপকাঠি দিয়ে সবাইকে বিচার করা ঠিক নয়। ভারতের সাধারণ মানুষের ঐহিক কল্যাণের জন্যে জড়বাদের প্রয়োজন আছে, যদিও জড়শক্তিকে আমাদের দেশের উপযোগী করে নিতে হবে।[১] প্রত্যেক দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে. স্বদেশের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়।[২] জাপানের অত্যাশ্চর্য উন্নতি স্বামীজিকে অভিভূত করেছে, তিনি ভারতের যুবকদের পরামর্শ দিয়েছেন জাপানে যেতে।[৩] আধুনিক সভ্যতার প্রবল শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা ক্রমেই পিছিয়ে পডছি। 'সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এস, বাইরে তাকিয়ে দেখ। দেখ, বিভিন্ন দেশ কিভাবে এগিয়ে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? স্বদেশকে ভালবাস? তবে এস. আমরা উন্নততর জীবনের জন্যে সংগ্রাম করি।'[৪] উন্নতি বলতে স্বামীজি শুধুই ঐহিক উন্নতি বোঝেন নি, কিন্তু ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে ঐহিক উন্নতির ওপর তিনি অনেক সময়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন. আমরা নির্বোধের মতো বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিন্দে করি। আঙুর ফল আমাদের নাগালের বাইরে, তাই বড টক। ভারতে প্রায় এক লক্ষ মানুষ আছেন, যাঁদের অধ্যাত্মচেতনা উন্নত স্তরের। কিন্তু এই এক লক্ষ মানুষের জন্যে কোটি কোটি লোক কি অনাহারে পশুর মতো জীবন কাটাবে? কেন একজন লোকও অনাহারে থাকবে? বস্তুবাদী সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যেই হিন্দুরা বিদেশীদের পদানত হয়েছে। গরিবরা যাতে কাজ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, তার জন্যে বস্তুবাদী সভ্যতার দরকার আছে। যে ঈশ্বর স্বর্গে অনন্ত শান্তির সন্ধান দেন, অথচ এই পার্থিব লোকে রুটির ক্ষুধা মেটাতে পারেন না, সে ঈশ্বরকে স্বামীজি অগ্রাহ্য করেছেন। গরিবের অন্নসংস্থান করতে হবে, শিক্ষার প্রসার চাই,

পুরোহিততন্ত্রের অবসান চাই, তবেই ভারত জেগে উঠবে। সনাতন ধর্মের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে য়ুরোপীয় সমাজব্যবস্থা এদেশে গড়ে তুলতে হবে। ভারতে নবজাগরণের এটাই পথ।[৫] মাদুরায় এক ভাষণে স্বামীজি বলেছেন, ভারতের অধ্যাত্মবাদ যেমন পশ্চিমী সভ্যতার মর্মমূলে আঘাত করেছে, তেমনি পশ্চিমী জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বন্যার মতো ভারতে এগিয়ে আসছে। এই বন্যা কেউ রোধ করতে পারবে না।[৬]

আমাদের অধ্যাত্মচেতনা পশ্চিমের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, আমাদের দেশেও পশ্চিমী সভ্যতার অনুপ্রবেশ কল্যাণপ্রদ। এইভাবে ভারসাম্য বজায় থাকবে। তার মানে এই নয় যে আমরা পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ করব, পশ্চিমী সভ্যতা থেকে নির্বিচারে সব কিছু গ্রহণ করব, অথবা ওরা আমাদের জীবনবোধ ও মূল্যবোধ পুরোপুরি মেনে নেবে। দুই সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাবে, এক নতুন সামঞ্জস্যবোধ গড়ে উঠবে, আদর্শ পৃথিবীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে। স্বামীজি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, সেই আদর্শ জগৎ কোনদিন বাস্তবায়িত হবে কিনা আমি জানিনা, সেই আদর্শ সমাজব্যবস্থার রূপায়ণ সম্পর্কে আমার নিজের মনে সংশয় আছে। কিন্তু সেই সমাজ আসুক বা না আসুক, আমাদের প্রত্যেককে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন সেই আদর্শ পৃথিবী আগামীকালই আসবে, যেন আমাদের প্রত্যেকের কাজের ওপর সেই আদর্শের রূপায়ণ নির্ভর করছে। পৃথিবীতে আর সবাই তার দায়িত্ব পালন করেছে, আদর্শ পৃথিবীর সৌধ গড়ে তোলার ব্যাপারে যেটুকু বাকি আছে তা শুধু আমারই করণীয় অংশ—এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।[৭] সত্যযুগ আসন্ন, এই স্বপ্নে ভারতের মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে : 'আমি বিশ্বাস করি যখন এক বর্ণ, এক বেদ প্রতিষ্ঠিত হবে, শান্তি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই সত্যযুগ আসবে।'[৮] বর্তমান ভারতের দিকে তাকিয়ে স্বামীজি বলেছেন, 'বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।'[৯] কিন্তু অন্ধকারের পরেই সূর্যোদয়, পতনের পরেই পুনরুত্থান। সেই অরুণোদয় স্বামীজির কল্পনায় এক মহাজাগরণের সূচনা :

> ...এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলা-প্রায় ক হইয়া যাইবে।[১০]

যে নিবন্ধ থেকে এই উক্তিটি নেওয়া হয়েছে সেখানে পুনরুত্থানের অর্থ প্রধানত

ক. এই উক্তিটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ।

অধ্যাত্মচেতনার জাগরণ। কিন্তু অধ্যাত্মচেতনার স্ফুরণে ঐহিক পুনরুত্থানের যে বড় ভূমিকা আছে, বিভিন্ন রচনায় ও ভাষণে স্বামীজি সেকথা জোর দিয়ে বলেছেন। পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই এক নতুন ভারত গড়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় :

> অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।[১১]

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন স্বতন্ত্র, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও পূর্ব-পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে মিলিয়ে দেবার সাধনা করেছেন। 'শিক্ষার মিলন' নিবন্ধে[১২] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পূর্বপশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন।

> বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
> অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥
>
> —ঈশোপনিষৎ, ১১

> [যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা—দেবতাজ্ঞান ও কর্ম—এই উভয়কে একত্র (অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলে) জানেন, তিনি কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে দেবতাজ্ঞানসহায়ে অমরত্ব লাভ করেন।]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্য-পীড়িত, সে নির্জীব ; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

২

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, অতীতে এদেশে অনেক বড় কাজ হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও বড় কাজ করার সময় ও ক্ষেত্র উপস্থিত হয়েছে। আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। হয় আমরা এগিয়ে যাব, অথবা পেছিয়ে যাব। হয় প্রগতি, অথবা অবনতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অতীতে অনেক মহান্ কাজ

করেছেন, কিন্তু আমাদের সেই অতীতকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, পূর্ণতর জীবনে পৌছতে হবে। পেছনে ফিরে যাওয়ার অর্থ অবক্ষয়, অবনয়ন, জাতির মৃত্যু।[১৩] 'পূর্ণতর' জীবন বলতে স্বামীজি বুঝেছেন সার্বিক অগ্রগতি, পশ্চিমী সভ্যতায় যা কিছু বরণীয় তা আত্মস্থ করে ভারতের সনাতন আদর্শকে উজ্জ্বলতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা।[১৪] ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখে তাঁর অনেক সময়ে মনে হয়েছে, এমন গভীর অন্ধকার আর কখনো আসেনি।[১৫] কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতের এক উজ্জ্বল ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে : তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এক বিশাল মহীরুহ। সেই ঊর্ধ্বমূলের সম্ভাবনা এখনই দেখা যাচ্ছে।[১৬] সেই ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ সম্পর্কে স্বামীজি এক জায়গায় বলেছেন :

> যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই —সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা ; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।[১৭]

এখানে স্বামীজি সব সময়ে অতীতের দিকে না তাকিয়ে সামনে তাকাতে বলেছেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন, অতীতের ভিতের ওপরই ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। আমাদের ধমনীতে মহান্ পূর্বসূরিদের রক্ত বয়ে যাচ্ছে ; সেই চেতনা ও বিশ্বাস নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, মহত্তর ভবিষ্যৎ তৈরি করতে হবে।[১৮]

অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পর্ক নিয়ে স্বামীজি বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন। চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পারম্পর্য অর্থহীন, মহাকালের ঘূর্ণাবর্তে পরিবর্তন প্রগতি ও ভবিষ্যতের কল্পনাও অর্থহীন। কিন্তু লৌকিক স্তরে প্রগতিবাদকে তিনি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেন নি। প্রগতি রূপান্তর সূচিত করে, যদিও রূপান্তর ও প্রগতি সমার্থক নয়। স্বামীজি বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ আংশিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন এবং পরস্পরবিরোধী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজের রূপান্তরের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন :

> …এখন এদেশে প্রায় সকলেই পরিণামবাদী—Evolutionist. যেমন ছোট জানোয়ার বদলে বদলে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখন কখন ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে ; তেমনি মানুষ যে একটা সুসভ্য অবস্থায় দুম ক'রে জন্ম

পেলে, এ কথা আর কেউ বড় বিশ্বাস করছে না।... আদিম মানুষ কাঠ-পাথরের যন্ত্রতন্ত্র দিয়ে কাজ চালাত, চামড়া বা পাতা প'রে দিন কাটাত, পাহাড়ের গুহায় বা পাখীর বাসার মতো কুঁড়ে ঘরে গুজরান ক'রত। এর নিদর্শন সর্বদেশের মাটির নীচে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোন কোন স্থলে সে অবস্থার মানুষ স্বয়ং বর্তমান। ক্রমে মানুষ ধাতু ব্যবহার করতে শিখলে, সে নরম ধাতু—টিন আর তামা। তাকে মিশিয়ে যন্ত্রতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র করতে শিখলে।... আদিম অবস্থার মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু জানোয়ার মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষবাস শিখলে, পশুপালন করতে শিখলে।... মানুষ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে তরুলতা, জীবজন্তু বদ্‌লাচ্ছিলেন, মানুষ জন্মে অবধি সে হুড়মুড় ক'রে বদলে দিতে লাগলো।[১৯]

স্বামীজি এক ভাষণে বলেছেন, ভারতের অধ্যাত্মচেতনা অতীতে মানব-সভ্যতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা আজ পৃথিবীতে ঘটছে—মানবতা ও সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি,[২০] যা বিশেষভাবে ইংরেজদের অবদান।[খ] পশ্চিমী সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম, প্রকৃতির ওপর মানুষেব অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।[গ] স্বামীজি বলেছেন, য়ুরোপ ভারতের কাছ থেকে শিখবে অন্তরপ্রকৃতিকে জয় করার মন্ত্র, আর ভারত য়ুরোপ থেকে শিখবে বাইরের প্রকৃতিকে জয় করার বিজ্ঞান।[২১] এই প্রসঙ্গে ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ সম্পর্কে স্বামীজির মত উল্লেখ করা যেতে পারে।[২২] জীবন সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনেরতত্ত্ব তিনি চূড়ান্ত বলে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে, নিম্নস্তরে মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমেব উদ্‌বর্তন ইত্যাদি নিয়ম কতকটা ঠিক বলে

খ. স্বামীজি অন্যত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের তীব্র নিন্দা করেছেন, কিন্তু মানবসভ্যতায় ইংরেজদের অবদানের কথা তিনি অস্বীকার করেননি। এখানে অবশ্য ব্যাপক অর্থে পশ্চিমী সভ্যতার অবদানের কথাই ভাবতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমী সভ্যতার মৌলিক ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

গ. আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান মানুষ ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক অর্থে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক। স্বামীজি প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে সমগ্র বিশ্বে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আছে ভারসাম্য আছে। 'একদিন হয়ত আমরা জেগে উঠে দেখব, মানুষের জীবনে সামান্য একটি কীটেরও বিশেষ ভূমিকা আছে, মানবজীবনে সে ভারসাম্য রক্ষা করছে।' (স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬।)

প্রতিভাত হয় ; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সব সময়ে এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। বিশেষভাবে যাঁরা উঁচু স্তরের মানুষ, যাঁদের মধ্যে নীতিবোধ ও বিচারবুদ্ধির বিকাশ হয়েছে, নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার পথ তাঁদের নয়। তাঁদের ধর্ম ত্যাগ। পশুরা অপর প্রাণীকে ধ্বংস করে বড় হয়, আর মানুষ বড় হয় আত্মত্যাগের সাধনায়, অপরের ওপর আধিপত্য লাভ করে নয়।[ঘ] স্বামীজি বলেছেন, প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনে নিয়ে মানুষ বড় হয়নি, মানবপ্রগতি সম্ভব হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে। গাছেরা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যায় না। প্রকৃতিকে পুরোপুরি মেনে নিলে মানুষ স্থাণু জড় শক্তিতে পরিণত হবে।[২৩] অথবা পশুর স্তরে নেমে যাবে।[২৪] তবে শুধু বহিঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেই হবে না, অন্তরপ্রকৃতির সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে—অন্তরপ্রকৃতিকে জয় করাই বিশেষভাবে ভারতের সাধনা। এখন বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ভারতকে বহিঃপ্রকৃতিকে আয়ত্ত করার রহস্য শিখতে হবে, ভারতীয় যোগসাধনা ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় চাই।[ঙ]

বিবেকানন্দ প্রকৃতিকে নানাভাবে দেখেছেন। সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপ থেকে দেখলে ব্রহ্ম ও জগৎ অভেদ, পুরুষ ও প্রকৃতি, এক ও বহু অভিন্ন।[২৫] আর এক দৃষ্টিতে, প্রকৃতি সীমাবদ্ধ ব্রহ্ম।[২৬] আবার আর এক দৃষ্টিতে, প্রকৃতি মায়া, দেশ-কাল নিমিত্তের জালে বদ্ধ, আত্মার আবরণ। প্রকৃতির দাসত্ব থেকে চৈতন্যের মুক্তিই সাধনার লক্ষ্য।[২৭] আবার ঐহিক স্তরে নেমে এসে স্বামীজি বলেছেন, বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করার সাধনায় ভারতকে আজ মন দিতে হবে, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার চাই, বৈজ্ঞানিক চেতনার অভাবই ভারতের অধঃপতনের একটি বড় কারণ।[২৮] অতীতে ভারতীয় মানস বিশেষ এক দিকে—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দিকে,

ঘ. ডারউইনের বন্ধু টমাস হেনরী হক্সলি—তাঁকে ডারউইনের 'বুলডগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল—১৮৯৩ সালে অক্সফোর্ডে 'ক্রমবিকাশবাদ ও নীতিবোধ' শীর্ষক এক বক্তৃতা দেন। হক্সলির বক্তব্যের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। স্বামীজি হক্সলির রচনাবলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন (স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮, ৭৪, ২১৮)।

ঙ. এই প্রসঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে স্বামীজির মত উল্লেখ করা যেতে পারে: 'আমার মত…একজন scientific (বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল ; layman (হাতুড়ে)—যারা বর্তমান science (বিজ্ঞান)-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা করা কিছু নয়।' ('স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০৮।) আবার স্বামীজি একথাও বলেছেন যে যৌগিক শক্তিতে (প্রাণায়াম) সমস্ত রোগ সারানো যায়। (ইংরেজি রচনাবলি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১।)

অন্তরপ্রকৃতিকে জয় করার দিকে—ঝুঁকেছিল, তার ফলে জীবনের অন্যান্ত দিক উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় এদেশ কখনও পিছিয়ে থাকেনি, বিজ্ঞানের অনেক শাখার প্রথম জন্ম এখানেই। গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ভারতেই শুরু হয়। নিউটনের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে ভারতীয় মনীষীরা মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মানুষের মনের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, মনকে জয় করতে পারলেই সব কিছু আয়ত্ত করা যাবে। যোগীরা নানারকম পরীক্ষা নিয়ে মগ্ন হয়ে রইলেন, পদার্থবিদ্যা এদেশ থেকে ক্রমে হারিয়ে গেল।[২৯]

উল্লেখপঞ্জী :

১. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫০।

২. তদেব, পৃ. ১৫২।

৩. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০। স্বামীজি বলেছেন, জাপানীরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, কিন্তু নিজেদের ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয়নি। আধুনিক জাপানী সভ্যতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃত সমন্বয় ঘটেছে। (ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৭২।)

৪. তদেব।

৫ তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

৬. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭১।

৭. তদেব, পৃ. ১৭১-৭২।

৮. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩১।

৯. ভাব্‌বার কথা, পৃ. ৪।

১০. তদেব।

১১. পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলি (১৩৬৮), খণ্ড ১৩, পৃ. ৫৫।

১২. তদেব, খণ্ড ১১, পৃ. ৬৭৪।

১৩. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫-৯৬।

১৪. তদেব, পৃ. ২৭১।

১৫. ভাব্‌বার কথা, পৃ. ৪।

১৬. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৬।

১৭. ভাব্‌বার কথা, পৃ. ১৩।

১৮. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৮৬।

১৯. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃ. ৯৬-৯৮।

২০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৪১।

২১. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

২২. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১১৮-২২।

২৩. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

২৪. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১১৮-২২।

২৫. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৮।

২৬. তদেব, পৃ. ১৩৭।

২৭. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৭ ৯৭, ২৪৮, ২৫৭, ২৬৪, ৪২০, ৪৫০, ৪৯৮; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৮।

২৮. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১৬, ৩৬৬; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭১; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪০২; সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৪৯, ৫০৭; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১৬৪।

২৯. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০-২১; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।

শিক্ষা ও প্রগতি

জীববিজ্ঞানীদের অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তন চলেছিল ধীরগতিতে, মানুষ এসে পরিবর্তনের গতি প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দিল।[১] এখানে প্রধান ভূমিকা মানুষের চেতনার। চেতনা পরিবর্তন ও রূপান্তরকে দ্রুততর করে। প্রাকৃতিক জগতে, মানুষের ঐহিক জীবনে, পারমার্থিক ক্ষেত্রে। পারমার্থিক ক্ষেত্রে অগ্রসরণের অর্থ চৈতন্যের উন্মীলন, অজ্ঞতার আবরণ সরিয়ে চৈতন্যের মুক্তি। চেতনার সিঁড়িতে যাঁরা ওপরের ধাপে তাঁরা অবরোধের বেড়া ভেঙে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান, মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়াই মানুষের পরম সাধনা।[২] শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন জায়গায় যেসব কথা বলেছেন, সেই সব মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর মতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই চেতনার বিকাশ। তবে এখানেও তাঁর আপেক্ষিকতা-বাদের কথা মনে রাখতে হবে।

চেতনার নানা স্তর, স্তর অনুযায়ী শিক্ষার তারতম্য। স্বামীজি বলেছেন, সকলের জন্যে এক আইন, এক নিয়ম 'মস্ত ভুল'।[৩] 'জাতি-ব্যক্তি-প্রকৃতি-ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা। জোর ক'রে এক করতে গেলে কি হবে?'[৪] তাই তিনি যেমন বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার পরম লক্ষ্যের কথা বলেছেন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষার ওপরও জোর দিয়েছেন। প্রত্যেকের প্রবণতা আলাদা, মানসিক গঠন আলাদা, সেইভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে থেকে জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দিলে হবে না। বাবা তাঁর বাচ্চা ছেলেকে একটি বই পড়তে দিলেন। বইটিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা কথা লেখা আছে। কিন্তু বাচ্চাটির মনের ঝোঁক কোন্ দিকে তা না বুঝে এ ধরনের বই তার হাতে দেওয়া ঠিক নয়। এতে তার মনের বিকাশের স্বাভাবিক গতি বাধা পাবে। এক এক গাছের এক এক রকম জমি দরকার। ঠিক জমিতে না বসালে চারাগাছ বাড়বে না। উপযুক্ত জমি পেলে গাছ আপনা থেকেই বেড়ে উঠবে। আমাদের কাজ শুধু তাকে বড় হয়ে ওঠার পথে সাহায্য করা, বাধা সরিয়ে দেওয়া। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। আধার অনুযায়ী শিক্ষা। শিক্ষকের কাজ ছাত্রের মাথায় কিছু তথ্য ও জ্ঞানের কথা ঢুকিয়ে দেওয়া নয়, তাকে তার নিজস্ব রাস্তায় এগিয়ে যেতে

সাহায্য করা। একটি শিশু একটি চারাগাছের মতো। জমিটা একটু আলগা করে দাও, যাতে তার বেড়ে ওঠা সহজ হয়। চারপাশে বেড়া বেঁধে দাও, যাতে গরু-ছাগলে না খায়, কেউ এসে উপড়ে না ফেলে। আর কিছু করার নেই। বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাবার চিরাচরিত ধারণা বাদ দিতে হবে। শুধু দেখতে হবে, তাদের ভেতরে যে শক্তি লুকিয়ে আছে, তা যেন স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে।[৫]

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য এই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। এই সুপ্ত শক্তির স্বরূপ কী? নানা স্তর থেকে বিবেকানন্দ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অদ্বৈতবাদীর চোখে প্রত্যেকেই শুদ্ধ আত্মা, পূর্ণ ব্রহ্ম। তাই শিক্ষার পরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান, নিজের স্বরূপকে চেনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা আছে তাকে আবিষ্কার করা, প্রকাশ করা। অন্তরায়, আবরণ দূর করে দেবতার উন্মোচন।[৬] আবার ঐহিক স্তরে নেমে এসে বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের সাধারণ মানুষের জন্যে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা একটু ভালো রুটি খেতে পায়, একটু ভালো কাপড় পরতে পায়।[৭] জীবনসংগ্রামের উপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান শিখতে হবে।[৮] 'যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।'[৯] ভারতের গরিব লোকেরা দর্শনশাস্ত্রের মূল কথাগুলো বোঝে, ধর্মতত্ত্বের উচ্চতম সোপানে তারা সহজেই পৌঁছতে পারে; কিন্তু জীবনযুদ্ধে টিঁকে থাকতে হলে যে প্রযুক্তিবিদ্যা দরকার তার অভাবে তারা কষ্ট পাচ্ছে।[১০] তাদের জন্যে চাই বৃত্তিমূলক শিক্ষা।[১১] ভারতের পক্ষে উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন, পশ্চিমী বিজ্ঞান ও বেদান্তের সমন্বয় চাই।[১২] তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন জনশিক্ষার ওপর। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা ঘোষালকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, ভারতে অল্প কিছু লোকের মধ্যে শিক্ষা কেন্দ্রীভূত ছিল, সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার হয় নি। এদেশের দুর্গতির এটাই প্রধান কারণ। দেশকে বড় করার একমাত্র পথ শিক্ষা। য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরে তিনি দেখেছেন, সেখানে নিচু তলার লোকেরাও লেখাপড়া জানে, আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় তারা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। তখন ভারতের দুঃখী মানুষের কথা ভেবে তাঁর চোখে জল এসেছে। একমাত্র শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়েই এই অবস্থা পাল্টানো যেতে পারে। শিক্ষা আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। লেখাপড়া শেখার ফলে পশ্চিমের গরিবদের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্ম জেগে উঠছে, আর আমাদের দেশে তামসিক সুষুপ্তি। ব্রহ্মের জাগরণ চাই, আত্মজ্ঞান চাই। তার মানে এই নয় যে সবাইকে জটা রেখে যষ্টি আর কমণ্ডলু নিয়ে

গুহায় গিয়ে তপস্যা করতে হবে। যে জ্ঞান পার্থিব বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, তা কি সাধারণ জাগতিক সমৃদ্ধি আনতে পারে না?[১৩]

বিবেকানন্দ ধর্ম ও মোক্ষের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আমরা মোক্ষ চাই, মুক্তি চাই, পাশ্চাত্যে ধর্মের প্রাধান্য। মোক্ষ শেখায় যে ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, সবরকম দাসত্বের বেড়ি ভাঙতে হবে। ধর্ম কি? —যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। (এখানে 'ধর্ম' কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার করা হয়েছে।) ধর্ম ক্রিয়াত্মক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্যে খাটাচ্ছে। এককালে ভারতে ধর্ম ও মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধপ্রভাবে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হল, মোক্ষমার্গই প্রাধান্য পেল। ধর্মের অভাবেই ভারতের আজ এমন দুরবস্থা। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালোই। কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ করো, তবে ত্যাগ হবে। যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে।[১০] 'এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে "ধর্মের" চেয়ে "মোক্ষ"টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।'[১৫] আমাদের দেশে আজ যা দরকার তা মোক্ষ ও ধর্মের সামঞ্জস্য। সেকথা মনে রেখে শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষাক্রম ঢেলে সাজাতে হবে। আমেরিকায় বিভিন্ন ভাষণে স্বামীজি বলেছেন, ভারতে মিশনারী প্রচারকের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা।[১৬] জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।[১৭] জাপানীরা পশ্চিম থেকে অনেক কিছু নিয়েছে, কিন্তু নিজে-দের সংস্কৃতিকে ছাড়ে নি। তাই জাপান এত উন্নতি করেছে।[১৮] ইংরেজরা এদেশে যে ধরনের বিজাতীয় শিক্ষা চালু করেছে তাতে স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার বদলে জাগে অবজ্ঞা, এ শিক্ষা দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন এক নাক-উঁচু সম্প্র-দায়ের সৃষ্টি করেছে।[১৯] পরানুকরণের এই মোহ, এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত জাতীয় শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।[২০] উচ্চশিক্ষার নামে এখন যা চলছে তাতে এই শিক্ষা তুলে দিলেও দেশের কোন ক্ষতি হবে না। যাতে

ছেলেরা চাকরির জন্যে দরজায় দরজায় না ঘুরে নিজেদের রুটি রোজগারের উপায় করতে পারে সেই শিক্ষাই এখন সবচেয়ে বেশি দরকার।[২১] স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান শেখাতে হবে,[২২] প্রযুক্তিবিজ্ঞান আয়ত্ত করে দেশে শিল্পবিকাশ ঘটাতে হবে, জীবিকার ব্যাপারে দেশের লোককে আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে।[২৩]

বিবেকানন্দ বলেছেন, শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ না হলে দেশের উন্নতি হবে না।[২৪] শিক্ষা ছাড়া আর কোন পথ নেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।[২৫] 'সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হ'লে কিছু হবার জো নেই।'[২৬] জনশিক্ষার মাধ্যম কি হবে? মাতৃভাষা।[২৭] আমাদের দেশের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে চায়, কিন্তু মাতৃভাষায় ভালো বই কোথায়? শুধু উপন্যাস আর নাটক। পশ্চিমে মাতৃভাষায় অসংখ্য বই লেখা হচ্ছে, বিদেশী ভাষায় নতুন কিছু বেরোলে সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের এটাই পথ।[২৮] তবে শুধু মাতৃভাষা নয়, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাও শিখতে হবে।[২৯] মাতৃভাষা হবে তথ্যের বাহন, আর সংস্কৃত উন্নততর সংস্কৃতির বাহন। রামানুজ, চৈতন্য, কবীর জনগণের ভাষায় শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার ফলে ভারতের নিচু শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চেতনার জোয়ার এসেছিল। এটা ভালো দিক। কিন্তু আর একটা দিকও আছে। সাধারণ মানুষকে তাঁরা সংস্কৃত শেখাবার চেষ্টা করেন নি, এবং এই কারণে এই মহাপুরুষদের শিক্ষার প্রভাব স্থায়ী হয় নি। বুদ্ধও সংস্কৃতের বদলে পালিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বাণী জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রভাবও স্থায়ী রূপ নেয় নি। জনগণকে শিক্ষা দিতে হলে তাদের স্তরে নামতে হবে, তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে। কিন্তু তাদের ওপরে তুলতে হলে উন্নততর ভাষার মাধ্যম চাই।[৩০] শিক্ষার দুই ধাপ। ঐহিক স্তর ও উন্নততর স্তর। ঐহিক স্তরে চাই বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকলে হবে না। আরও উঁচু ধাপে উঠতে হবে। শুধু তথ্য আহরণ করলেই হবে না, নিজেকে জানতে হবে। প্রথমে বাইরের জগতকে আয়ত্ত করার বিজ্ঞান, তারপর আত্মজ্ঞান। শিক্ষার শেষ ও আসল লক্ষ্য এই আত্মজ্ঞান। তাই শিক্ষাবিস্তার করতে হলে প্রকৃত শিক্ষক চাই। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদেরই শিক্ষকতার ভার নিতে হবে। এই সন্ন্যাসী-শিক্ষকদেরও আগে নিজেদের ঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক—দু'ধরনের শিক্ষাই তাঁদের নিতে হবে।[৩১] এই ভাবী আদর্শ শিক্ষকদের জন্যে আধুনিক কালোপযোগী ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করতে হবে। তাঁদের

ব্যাকরণ দর্শন বিজ্ঞান কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি ভক্তিশাস্ত্র আর ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে।[৩২] গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের মনের দরজায় তাঁদের পৌঁছতে হবে, সকলের মধ্যে আত্মজ্ঞান, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।[৩৩] মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ভার নেবেন ব্রহ্মচারিণীরা। তাঁদের জন্যেও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পুরাণ, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, ইংরেজি, ঘরকন্না, রান্নাবান্না, শরীরপালন, শিশুপালন—এসব বিষয়ে তাঁদের শিক্ষা দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে, যাতে তাদের ত্যাগব্রতে অনুরাগ জন্মায়।[৩৪] 'যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে।'[৩৫] 'মেয়েরা মানুষ হ'লে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।'[৩৬]

উল্লেখপঞ্জী

১. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃ. ৯৮।

২. বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯।

৩. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃ. ৮।

৪. তদেব।

৫. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫ , পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

৬. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৪, ২৩৯-৪০ ; চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৮, ৪৮৪ , পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

৭. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৮৫।

৮. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১০৬-৭।

৯. তদেব, পৃ. ১০৭।

১০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৮৫।

১১. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০৩, ৪৬৬, ৪৬৮ , চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৫ , পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭২।

১২. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

১৩. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮২-৮৪।

১৪. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃ. ৬-৮।

১৫. তদেব, পৃ. ৯।

১৬. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬৬, ৪৬৮।

১৭. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

১৮. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

১৯. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৭, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫১, ২৪৭, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩১৯, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬। 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৪৯-৫৩।

২০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

২১. তদেব, পৃ. ৩৬৭।

২২. তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫, ৫০৭, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪০২।

২৩. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

২৪. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২৮।

২৫. তদেব, পৃ. ৩৩।

২৬. তদেব, পৃ. ২৯।

২৭. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯০।

২৮. তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।

২৯. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১২৫, ২০২। ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১।

৩০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১।

৩১. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৭, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০৩, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩, ৪৮৪-৮৫; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪২৪-২৫। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২৯, ১২৫, ১৩৪-৩৫, ২০২-৩।

৩২. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১২৫।

৩৩. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৬, ২২৪-২৫, ২৩৮, ৩০৩, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩, ৪৮২-৮৫।

৩৪. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২৯, ৩৩, ২০২-৩।

৩৫. তদেব, পৃ. ২০৩।

৩৬. তদেব, পৃ. ২০৫।

প্রসঙ্গ : নারী

মেয়েদের সম্পর্কে বিবেকানন্দ কি ভাবতেন? নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজির আচরণ দেখে মনে হত, মেয়েদের শরীর বলে কিছু নেই, তারা শুধুই মন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে মেয়েরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।[১] তার মানে এই নয় যে মেয়েদের দুর্বলতার কথা তিনি জানতেন না। তিনি বলেছেন যে অন্তঃপুরে পর্দানশিন থাকার ফলেই ভারতের মেয়েদের মধ্যে অনেক সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে, তারা পরনিন্দা পরচর্চায় দিন কাটায়।[২] মাতৃত্বকে তিনি বড় স্থান দিয়েছেন, কিন্তু সন্তান-বাৎসল্যে অন্ধ মায়াবদ্ধ মায়ের দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মাতৃস্নেহ জৈবিক আসক্তির বেড়ি।[৩] এটা নিচু স্তরের কথা। ওপরের স্তরে, মা আদর্শ নারী। পশ্চিমে পুরুষরা মেয়েদের যৌবন ও সৌন্দর্যের আরাধনা করে।[৪] সেখানে নারী মানেই স্ত্রী। ভারতে ঈশ্বরকে দেবীশক্তিরূপে ভাবা হয় তাই ভারতবাসীর চোখে নারীত্ব আর মাতৃত্ব এক হয়ে গেছে।[৫] মাতৃত্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক কেন? মাকে কেন ভারতের লোকেরা পুজো করে? তার কারণ, সন্তানের জন্মকে সার্থক করার জন্যে মায়ের পবিত্র জীবনযাপন, মায়ের প্রার্থনা। যৌন-সংগম তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়সুখের ব্যাপার নয়। ঈশ্বরের প্রতীক সন্তানকে পৃথিবীতে আনার জন্যে তিনি যৌন আনন্দকে প্রার্থনার স্তরে নিয়ে যান। ব্যক্তিগত সুখ তাঁর কাম্য নয়, সন্তানের কল্যাণে তিনি সমস্ত জীবন দুঃখ সহ্য করেন। মায়ের জীবন তপস্যা, দুঃখবরণ, তিতিক্ষার কাহিনী।[৬]

বিবেকানন্দ বলেছেন, যেখানে স্ত্রীলোকের মর্যাদা নেই, স্ত্রীলোকেরা যেখানে নিরানন্দে বাস করে, সে সংসারের, দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি মনুর শ্লোক (মনুসংহিতা, ৩।৫৬) উল্লেখ করেছেন : 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।' যেখানে নারীরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন। যেখানে নারীরা সম্মানিতা হন না, সেখানে সব কাজই নিষ্ফল।[৭] আর্যসমাজে মেয়েদের স্থান খুব বড় ছিল। বেদে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য করা হয় নি।[৮] বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া ছিলেন। জনকের রাজসভায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান

করেছিলেন।[৯] গীতায় (১৮।৪৬) আছে : 'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥' যে সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি বা কর্মচেষ্টা, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত, তাঁকে মানুষ নিজের বর্ণাশ্রমের কর্ম দ্বারা অর্চনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করে। অর্থাৎ আর্য অনার্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র স্ত্রীপুরুষ সকলেরই আত্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সমং ব্রহ্ম (৫।১৯)। ব্রহ্ম সর্বত্র অভিন্ন। সমং সর্বেষু ভূতেষু (১৩।২৮)। ব্রহ্ম সর্বভূতে সমভাবে রয়েছেন।[১০] সুতরাং সবাই পরম সত্যে পৌঁছতে পারে। পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে, মেয়েরা পারবে না কেন? মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তাঁর প্রতিভায় হাজার হাজার মেয়ে জেগে উঠবে। দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।[১১] সমাজের প্রগতির পরিচয় মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে।[১২] প্রাচীন গ্রীসে নারীদের প্রতি বৈষম্য ছিল না।[১৩] প্রাচীন ভারতে সহশিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল,[১৪] পঠনপাঠনের ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল।[১৫] যিশুর আদর্শ সাম্য, কিন্তু তিনি মেয়েদের সমান অধিকার দেন নি, তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কোন মেয়ে নেই। ইহুদী সামাজিক বিধান তিনি মেনে নিয়েছিলেন।[১৬] স্বামীজি বলেছেন, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন, ইসলামধর্মমতে মেয়েদের আত্মা নেই। এই ধারণা ঠিক নয়। মেয়েদের আত্মা নেই এমন কথা কোরানে কোথাও বলা হয় নি, বরং মেয়েদের যে আত্মা আছে তা স্বীকার করা হয়েছে।[১৭] বুদ্ধ মেয়েদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর প্রথম ও সবচেয়ে বড় শিষ্যা ছিলেন তাঁর স্ত্রী।[১৮] কিন্তু এই বৌদ্ধযুগেই মেয়েদের মর্যাদা কমে যায়। বুদ্ধ বিরাট সংগঠক ছিলেন, তিনি ধর্ম প্রচার করেন মঠকে কেন্দ্র করে। মঠে ভিক্ষুণীদের চেয়ে ভিক্ষুদের প্রাধান্য বেড়ে গেল, মেয়েদের স্থান নিচে নেমে গেল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সারা দেশটা একটা বিরাট মঠে পরিণত করল, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মোক্ষ বা নির্বাণ। 'পবিত্রতা'র যূপকাষ্ঠে বলি হল মেয়েরা—তাদের বলা হল জৈবিক মায়ার শিকল, নরকের দ্বার।[১৯] বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগে বীভৎস বামাচারে দেশ ছেয়ে গেল, মেয়েদের অসম্মান বাড়তে লাগল।[২০] তারপর বিদেশী আক্রমণের ফলে মেয়েরা অন্তঃপুরে বন্দী হয়ে রইল, সমাজে তাদের মর্যাদার আসন আর রইল না।[২১]

বিবেকানন্দ বলেছেন, আত্মায় কোন লিঙ্গভেদ নেই। মেয়ে-পুরুষের শারীরিক পার্থক্য ভুলে যেতে হবে, মনে রাখতে হবে সবই আত্মা।[২২] 'আমি-তুমি' এই আপেক্ষিক স্তরে লিঙ্গভেদ আসে। মন যত অন্তর্মুখ হতে থাকে, ততই এই ভেদ-

জ্ঞান চলে যায়। শেষে মন যখন সমরসে ডুবে যায়, তখন আর স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান একেবারেই থাকে না। সুতরাং মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য বাইরের ব্যাপার, স্বরূপে কোনো পার্থক্য নেই।[২৩] বেদান্তমতে একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজমান। অথচ ভারতেই এক সময়ে ব্রাহ্মণেতর জাতকে বেদপাঠের অনধিকারী বলে নির্দেশ করা হল, মেয়েদেরও সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।[২৪] যৌনসম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে মেয়েদের মানুষ হিসেবে সম্মান করতে হবে, তবেই মেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হবে।[২৫] পশ্চিমে মেয়েদের প্রতি পুরুষদের আচরণ খুবই সৌজন্যপূর্ণ, কিন্তু তারা যৌনসম্পর্কের কথা ভুলতে পারে না। সেখানে মেয়েদের প্রতি ভদ্রতা মানে তাদের শারীরিক সৌন্দর্যের স্তুতি। আসলে তারা মেয়েদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয় না, খেলার পুতুল হিসেবেই দেখে।[ক] বিবাহ-বিচ্ছেদের এটাই কারণ।[২৬] ভারতীয় দর্শনে যৌনভেদ স্বীকার করা হয় নি, কিন্তু বেদান্ততত্ত্ব ও লোকাচারের মধ্যে ব্যবধান রয়ে গেছে, শ্রুতির বদলে প্রাধান্য পেয়েছি স্মৃতি।[২৭] বিবেকানন্দের মতে, আধুনিক হিন্দুধর্ম প্রধানত পৌরাণিক, বুদ্ধোত্তর যুগ থেকে এই অধঃপতন আরম্ভ হয়েছে। মেয়েদের প্রতি বৈষম্য, মেয়েদের অবমাননা এই অধঃপতনের বহিঃপ্রকাশ। দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে স্ত্রীর শালগ্রাম শিলা ছোঁবার অধিকার নেই।[২৮] 'মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে।…তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই-সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।'[২৯] বিবেকানন্দ বলেছেন, মেয়েরা কোন অংশে ছোট নয়। পুরুষের মতোই তাদের সাহস,[৩০] সব কাজ করার যোগ্যতাই তাদের আছে।[৩১] অনেক সময়ে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে পুরুষের দৈহিক ক্ষমতা বেশি, মেয়েরা দুর্বল, লড়াই করার শক্তি তাদের নেই।[খ] এই তুলনা মেয়েদের প্রতি অবিচার। মেয়েরা যে ধৈর্য, সহনশীলতা

ক. কিন্তু অন্যত্র স্বামীজি পশ্চিমী সমাজে—বিশেষত মার্কিন দেশে—মেয়েদের মর্যাদা ও প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেছেন। (ইংরেজি রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬১, ৪৮৫; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২; সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৮৯; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩২৫।) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে (পৃ. ৭৮) দেবীশক্তির পূজা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: '…আমাদের পুজো ঐ তীর্থস্থানেই; সেইক্ষণ মাত্র; এদের দিনরাত, বার মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির।'

খ. এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য ('সাম্য', পঞ্চম পরিচ্ছেদ) উল্লেখ করা যেতে পারে: 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট।…যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।…কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, পুরুষ বলবান, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু…স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা

ও ভালবাসা দিয়ে বাচ্চাকে বড় করে তোলে, তা পুরুষের সাধ্যাতীত। পুরুষদের আছে কাজ করার শক্তি, মেয়েরা তাদের শক্তির পরিচয় দেয় দুঃখ সহ্য করার মধ্য দিয়ে।[৩২] দুঃখবরণের আদর্শের উজ্জ্বলতম প্রতীক সীতা। পশ্চিমে ভোগের আদর্শ, মানুষ কতটা পেতে পারে তা পশ্চিমের জীবনধারা থেকে জানা যায়। ভারত দেখিয়েছে মানুষ কতটা ত্যাগ করতে পারে, কতটা কষ্ট সহ্য করতে পারে। সীতা এই জীবনবোধের মূর্ত বিগ্রহ,[৩৩] আদর্শ নারীত্বের আদিরূপ।[৩৪] বনবাসে নির্বাসনের চেয়ে বেশি অবিচার আর কী হতে পারে! কিন্তু তিনি নীরবে, বিনা প্রতিবাদে সব অন্যায়, সব অবিচার সহ্য করেছেন, স্বামীর বিরুদ্ধে কোনদিন কোন অভিযোগ করেন নি।[গ] কোন তিক্ততার, ক্ষোভের কালিমা তাঁর চরিত্রকে স্পর্শ করে নি।[৩৫] ভারতে প্রত্যেক মেয়েকে আশীর্বাদ করা হয় : 'তুমি সীতার মতো হও।'[৩৬] সীতার সহিষ্ণুতা, পতিপ্রেম, সতীত্ব, পবিত্রতা নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। বিবেকানন্দ সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের মহিমার কথা বলেছেন,[৩৭] কিন্তু তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মেয়েরা দাসী নয়,[৩৮] স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী। ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। বাড়ি থাকলেই গৃহ হয় না, গৃহ তৈরি করেন গৃহিণী।[৩৯] কিন্তু শুধু গৃহকর্ম, পাতিব্রত্য, দুঃখবরণের শক্তির কথাই স্বামীজি বলেন নি। একদিকে যেমন তিনি সীতার আদর্শ তুলে ধরেছেন, আর একদিকে তুলে ধরেছেন ঝাঁসির রানীর দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন, এতদিন মেয়েদের অসহায় করে রাখা হয়েছে, ফলে তারা আত্মনির্ভরতা হারিয়েছে। সামান্যতম বিপদ বা দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তারা কান্নাকাটি আরম্ভ করে। এই পরনির্ভরতার সংস্কার থেকে তাদের মুক্ত হতে হবে, সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে জীবনের

ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান, বাঙ্গালি দুর্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু·· তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন?'

গ. লক্ষ্মণের কাছে লোকাপবাদ ও বনবাসের নিদারুণ সংবাদ জেনে সীতা বলেছেন, 'স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্তব্য।' (বাল্মীকি-রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, আটচল্লিশ সর্গ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ।) কিন্তু যুদ্ধজয়ের পরে রাম যখন সীতার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে পরিত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করেছেন, তখন সীতার উত্তরে তাঁর তীব্র বেদনা, ক্ষোভ ও তিক্ততা ফুটে উঠেছে। 'যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ় কথা বলে, সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতিকটু অবাচ্য রুক্ষ কথা কহিতেছ।·· তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচ লোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ···।' (তদেব, যুদ্ধকাণ্ড, ১১৭ সর্গ।)

মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আজকের বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের আত্মরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় অনুশীলনও করতে হবে।[৪০]

অতীত মর্যাদার আসনে মেয়েদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ 'শিক্ষা।[৪১] বিবেকানন্দ মেয়েদের জন্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষার কথা বলেছেন : গৃহকর্ম ও শিশু-পালন, শরীরচর্চা,[ঘ] ব্রহ্মচর্য,[ঙ] প্রাচীন ধর্মগ্রন্থপাঠ, ইংরেজিভাষা শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা।[৪২] প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য খুবই গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু আধুনিক পশ্চিমী সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করলে মেয়েদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হবে না।[চ] ভারতীয় মেয়েদের পবিত্রতা তাঁর চোখে অতুলনীয়, কিন্তু তাঁর একথাও মনে হয়েছে যে পশ্চিমের মেয়েদের কাছ থেকে তাদের অনেক কিছু শেখার আছে। য়ুরোপ-আমেরিকার মেয়েদের আচরণের সমালোচনা তিনি অনেক ক্ষেত্রে করেছেন,[৪৩] কিন্তু তাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর আধুনিক শিক্ষিত মেয়েদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকার মেয়েরা একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। শিক্ষা, মননশীলতা,

ঘ. বিবেকানন্দ স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই শরীরচর্চার ওপর জোর দিয়েছেন (ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২০, ২২৪, ২৪১-৪২ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৪২)। এই প্রসঙ্গে তার বিখ্যাত উক্তি (তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪২) স্মরণ করা যেতে পারে : 'গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আরও কাছে যাওয়া যেতে পারে।' শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি বলেছেন, মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী সমানভাবে সুগঠিত ও পরিপুষ্ট হওয়া চাই। লোহার মতো শক্ত স্নায়ু ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে সমস্ত জগৎ পদানত হয়। শরীরে মনে শক্তি না থাকলে আত্মাকে লাভ করা যায় না। মন শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। শরীর ভালো না হলে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। আগে শরীরকে গড়ে তুলতে হবে, তবে মনের ওপর ক্রমে ক্ষমতা জন্মাবে। ('স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১৭, ৯৫, ১২৩।)

ঙ. বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্রহ্মচর্য শুধু মেয়েদের জন্যেই নয়, স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই পালনীয়। (ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৩২।)

চ. স্বামীজি বলেছেন, মেয়েদের শুধু পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না, সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পৃ. ৩৩।) এই প্রসঙ্গে মেয়েদের পোশাক সম্পর্কে তাঁর মত উল্লেখ করা যেতে পারে। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি বলেছেন, আহার, পোশাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়ে যায়। ('স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পৃ. ২৫৫।) 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে (পৃ. ৫২) তিনি লিখেছেন, 'যখন ভারত-বাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !!' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে (পৃ. ৩২-৩৩) তিনি ভারতের মেয়েদের শাড়ি আর পুরুষদের চোগা-চাপকান-পাগড়ির সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে 'আমাদের কাজকর্মের পোশাক নেই' ; 'এদের পোশাক কাজকর্ম করবার অত্যন্ত উপযোগী'।

পবিত্রতা ও সহৃদয়তায় তারা অনন্য।[৪৪] বিবেকানন্দ দুঃখ করে বলেছেন, মার্কিন দেশের মেয়েরা শিক্ষায় এত এগিয়ে আছে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিছিয়ে পড়েছে কেন?[৪৫] ভারতের মেয়েদের অবস্থা পাল্টাতে হলে সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন করতে হবে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে,[৪৬] বিয়েতে যৌতুকের দাবি বন্ধ করতে হবে।[৪৭] কিন্তু এইসব সংস্কার সমস্যার মৌলিক সমাধান নয়। আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকেরা বিধবা-বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করেছেন, কিন্তু বিধবাদের বিয়ে দিলেই মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না, এটা ভারতের সত্তর ভাগের মেয়ের জীবনের সমস্যা নয়।[৪৮] মৌলিক সমাধান, শিক্ষা। ব্যবহারিক শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা আজকের দিনে খুব দরকার, কিন্তু সবচেয়ে বড় শিক্ষা, আত্মজ্ঞান। মেয়েদের বুঝতে হবে যে তাদের মধ্যে দেবীশক্তি, ব্রহ্মশক্তি রয়েছে।[৪৯] সেই চেতনা জেগে উঠলেই আর তারা ছোট হয়ে থাকবে না, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বিবেকানন্দ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মেয়েদের আত্মনির্ভরতার ওপর। শিক্ষা পেলে মেয়েরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে, বাইরে থেকে কোন সমাধান চাপিয়ে দিলে হবে না। মেয়েদের মুক্তির পথ তাদের নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে।[৫০]

উল্লেখপঞ্জী .

১. শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত *Letters of Sister Nivedita* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
২. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।
৩. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৩।
৪. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৬।
৫. তদেব, অষ্টম খণ্ড পৃ. ৫৭।
৬. তদেব, পৃ. ৬১।
৭. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৬; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০০-১।
৮. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৩০।
৯. তদেব; স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০০।
১০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।
১১. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০৪।
১২. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।
১৩. তদেব।
১৪. তদেব, পৃ. ২০৭।

১৫. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯১ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৩০ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৮ ।

১৬. তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৭৭ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৮ ।

১৭. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৯২ ।

১৮. তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৭৮ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৮ !

১৯. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৫ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৩০ ।

২০. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১১৫ ।

২১. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮, ৫১০ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২৯, ৩১৩ ।

২২. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭৩ ।

২৩. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পৃ. ২০৪ ।

২৪. তদেব, পৃ. ২০০ ।

২৫. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪১২ ।

২৬, তদেব, পৃ. ৪১২-১৩ ।

২৭. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০০ ।

২৮. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২৯ ।

২৯. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০০ ।

৩০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬ ।

৩১. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩ ।

৩২. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬ ।

৩৩. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ০৫ ।

৩৪. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৫ ।

৩৫. তদেব. চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৬ ।

৩৬. তদেব, পৃ. ৭৬ ।

৩৭. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৫ ; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৫-৫৬, ৪৬৬, ৫০৬ ; চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৭, ৪৭৯-৮০ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৪২, ৪১২ ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭ ।

৩৮. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭ ।

৩৯. তদেব ।

৪০. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৪২ ।

৪১. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৬ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৪, ২২৯-৩১, ৩৪২ ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৩, ১১৫ ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৩২-৩৩, ২০৫ ।

৪২. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩ ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৩৩ ।

৪৩. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪১২-১৩ ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৩১ ।

৪৪. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২, ২৪, ২৫, ২৮, ৫১, ১৮৩ ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭২ ; সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩২৫ ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৭৪ ।

৪৫. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৪ ।

৪৬. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯২ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৪১ , ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৩, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৩১-৩২ ।

৪৭. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৬ ।

৪৮. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৬ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৯ ।

৪৯. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০৪ ।

৫০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৬ ; চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬২ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২৯-৩০ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৯১ ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৩২-৩৩ ।

শ্রুতি ও স্মৃতি

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন রজোগুণের বিকাশের ওপর, এবং এই কারণেই তিনি বস্তুবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সত্যের দুটি রূপ আছে—একটি ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, আর একটি আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল। আমরা যখন সমাজ-সংস্কারের কথা বলি, প্রগতির কথা বলি, তখন সত্যের এই আপেক্ষিক পরিবর্তনশীল চেহারার কথাই আমাদের মনে থাকে।[১]

এই প্রসঙ্গে স্বামীজি হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদির দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন[২] : শ্রুতি (বেদ-বেদান্ত) আর স্মৃতি ও পুরাণ। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মের রূপ পাল্‌টে যায়, এক এক যুগে এক এক ধরনের নিয়ম প্রচলিত হয়। নতুন পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন বিধান তৈরি হয়, নতুন বিধান তৈরি করা প্রয়োজন হয়। বেদান্তে যা বলা হয়েছে, তা শাশ্বত সত্য, কিন্তু স্মৃতি সম্পর্কে সে-কথা বলা যাবে না। যাঁরা গোঁড়া, সনাতন হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজ-সংস্কারের পথরোধ করতে চান, তাঁরা সত্যের এই আপেক্ষিকতা বুঝতে পারেন না। তাঁরা ভুলে যান যে সামাজিক রীতিনীতির সংস্কারের অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা নয়। এক সময়ে এই ভারতেই গরুর মাংস না খেলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকত না। বেদে আছে, বাড়িতে সন্ন্যাসী, রাজা বা কোন বিশিষ্ট অতিথি এলে সবচেয়ে ভালো ষাঁড়টিকে কাটা হত[ক] পরে চাষবাসের প্রচলন হলে গোহত্যা অন্যায় বলে মনে হল, কারণ গরু কৃষি কাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক। গোহত্যা নিষিদ্ধ হল। আগে যেসব রীতি-নীতি প্রচলিত থাকে, সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সেগুলি অন্যায়, বর্বরোচিত বলে মনে করা হয়। সমাজের চেহারা পাল্‌টে গেলে রীতিনীতির, নিয়মের পরিবর্তন

ক. 'আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন।' ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃ. ৪৭।)

দরকার, না হলে সমাজ বাঁচতে পারেনা।[৩] স্বামীজি বলেছেন, কোন কোন ব্যক্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণ্ডি ছাড়িয়ে উঠতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, প্রত্যেক ধর্মীয় যুদ্ধের পেছনে আছে অর্থনৈতিক যুদ্ধ।[৪] সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান রীতিনীতিই পাল্টায় না, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণাও পাল্টে যায়। আমরা মানুষের, ভক্তের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করি, কিন্তু ঈশ্বরেরও যে ক্রমবিকাশ হয় তা বুঝতে পারিনা। কিন্তু ভক্তের, পূজকের যেমন পরিবর্তন হয়, ঈশ্বরেরও পরিবর্তন হয়।[৫] মানুষ নিজের স্বপ্ন, নিজের আদর্শ দিয়েই ঈশ্বরকে কল্পনা করে। আমরা বদ্ধ জীব, কিন্তু মুক্তির পিয়াসী, আর ঈশ্বরের মধ্যে আমরা এই মুক্তির রূপ দেখতে চাই। অনেক ধর্মে পূর্বপুরুষের, প্রেতাত্মার পুজো করা হয়, এই প্রেতাত্মারা অনেকে নৃশংস রক্তশোষক, মদ্যপায়ী। এই জাতীয় নিম্নতম স্তরের ধর্মেরও মূল কথা বন্ধনহীনতা, মুক্তি। ঘরের দরজা বন্ধ, আমি বাইরে বেরতে পারছি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরকে এই বন্ধ দরজা আটকাতে পারেনা, কোন সীমার শাসনে তিনি শৃঙ্খলিত হন না।[৬] প্রাচীন দেবতারা খুব শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু নৈতিক দিক থেকে তাঁদের শ্রদ্ধা করা যায় না। তাঁদের অনেক কাজ দেখে এখন আমরা ঘৃণায় শিউরে উঠব, কিন্তু আজকের মানসিকতা দিয়ে তাঁদের বিচার করলে চলবে না আমাদের মনে রাখতে হবে, আদিম মানুষেরা এই দেবতাদের ভয় ও শ্রদ্ধা করত, এঁদের কোন কাজ তাদের চোখে বিসদৃশ বা অসংগত মনে হত না। প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা আলোচনা করতে হলে আমাদের সেই যুগে ফিরে যেতে হবে, সেই যুগের ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। প্রাচীন বিশ্বাস যেমন আমাদের কাছে হাস্যকর বা অসংগত মনে হয়, আমাদের উত্তরসূরিদের চোখেও তেমনি আমাদের চিন্তা ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি উদ্ভট বলে মনে হবে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সব কিছু বদলে যায়। ঈশ্বরের রূপও। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর পরিবর্তমান। তিনি ধ্রুব সত্য, অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণা যুগে যুগে পাল্টাচ্ছে, পর্দার পর পর্দা সরে যাচ্ছে।[৭] সত্যের এই দুই রূপ—শাশ্বত ও আপেক্ষিক—আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই। এই স্তরে পরিবর্তন শুধু অবশ্যম্ভাবী নয়, পরিবর্তন কাম্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজি পৃথিবীতে—বিশেষভাবে, ভারতে—সামাজিক বিপ্লবকে অভ্যর্থনা করেছেন।

উল্লেখপঞ্জী :

১. স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলি, সপ্তম খণ্ড, প. ৭৯ '
২. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১১১-১২ ; ১২১ ।
৩. তদেব, পৃ. ১৭৪ ।
৪. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪ ।
৫. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৭ ।
৬. তদেব, পৃ. ১০৩ ।
৭. তদেব, পৃ. ১০৫-৭ ।

সমাজের বিবর্তন : বিভিন্ন বর্ণের আধিপত্য

বিবেকানন্দ বলেছেন, তিনি সাধারণ অর্থে সমাজসংস্কারক নন। তাঁর সাধনা আত্মজ্ঞানের সাধনা। আত্মজ্ঞান থেকেই অদ্বয়বোধ ও সমদর্শন।[১] এই বৈদান্তিক উপলব্ধিই তাঁকে পৌছে দিয়েছে সমস্যাদীর্ণ লৌকিক জীবনে। বনের বেদান্তকে তিনি ঘরে এনেছেন, এনেছেন দরিদ্র মানুষের কুটিরে।[২] জ্ঞান এসে মিলেছে প্রেমে ও কর্মে। স্বামীজির ইতিহাসচেতনা ও বৈপ্লবিক সমাজবাদের মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বেদান্তদর্শনের এই নতুন ব্যাখ্যায়। 'শঙ্কর এ অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি।'[৩] তিনি বলেছেন, বেদান্তের ভিতের ওপর সমাজ-বিপ্লব ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৪] শুধু তত্ত্বকথায় সমাজের পরিবর্তন আসবে না, সমাজবিপ্লবকে সার্থক করতে হলে দরিদ্র অবহেলিত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা চাই। সমস্ত হৃদয় উজাড় করে যে প্রেম, শুধু সেই প্রেমই দেশকে সমাজকে জাগিয়ে তুলতে পারে।[৫] মাদ্রাজে এক ভাষণে তিনি বলেছেন. শুধু বুদ্ধি বা যুক্তির পথে খুব বেশি দূরে এগোনো যায় না, তীব্র অনুভব চাই 'তুমি কি অনুভব কর যে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারক্লিষ্ট? তুমি কি অনুভব কর যে অজ্ঞতা সমস্ত দেশের ওপর কালো মেঘের মতো ছেয়ে এসেছে? এই বোধ কি তোমাকে অস্থির করে তুলেছে? তোমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে? তোমার রক্তে, তোমার শিরায় আলোড়ন তুলেছে?'[৬] এই আলোড়ন ছাড়া দেশকে জাগানো যাবে না, সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা যাবে না।

যে অনুভবের কথা বিবেকানন্দ বলেছেন, সেই তীব্র তিক্ত ক্ষুব্ধ প্রেমসিক্ত অনুভবের স্পর্শ আমরা পাই তাঁর লেখায়, তাঁর কণ্ঠে, বিশেষভাবে দুস্থ নিপীড়িত মানুষের কথায়। এই প্রেম বিবেকানন্দ-মানসের একটি প্রধান দিক। কিন্তু ইতিহাসের ধারাকে তিনি দেখেছেন নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, যদিও তাঁর সমাজ-চেতনা তাঁর প্রেমময়তারই প্রকাশ। ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন, পৃথিবীর সব সমাজেই চার বর্ণের অধিপত্য দেখা যায়: ব্রাহ্মণ (বা পুরোহিত শ্রেণী), ক্ষত্রিয় (বা সৈনিক), বৈশ্য (বা ব্যবসায়ী), এবং শূদ্র (বা

শ্রমিক)।[৭] প্রথমদিকে ছিল পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে পুরোহিত শ্রেণীকে পরাজিত ও পদানত করে ক্ষমতা দখল করল ক্ষত্রিয়রা : হয় এক সার্বভৌম রাজার শাসন, অথবা ছোট এক গোষ্ঠীর শাসন। ক্ষত্রিয়দের পরে বৈশ্য-শক্তির অভ্যুদয়—যা আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য।[৮] প্রথমে বিদ্যার, পরে শক্তির প্রাধান্য। তারপর টাকার প্রাধান্য।

> ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'বিদ্যা সকল বলের বল, আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'—দিনকতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ' ···কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ! 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী, অনন্ত শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য ইহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু, সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।[৯]

প্রত্যেক বর্ণের শাসনেরই ভালো মন্দ দু'দিকই আছে। পুরোহিতদের ক্ষমতার উৎস বুদ্ধি, তাই পুরোহিততন্ত্রে আমরা দেখি বিদ্যাচর্চার স্ফূর্তি। পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের ওপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের ওপর চৈতন্যের প্রথম অধিকার বিস্তার। পুরোহিত মানব-সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক : 'বহুকল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবনে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত।'[১০] কিন্তু আলোর আর এক পিঠে অন্ধকার। এবং শুভ-অশুভের উৎস একই। পুরোহিত চিন্তাশীল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁকে অন্নের সংস্থান করতে হয় না,[১১] ফলে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের বিচ্ছেদ। শক্তির আধার ও বিকাশকেন্দ্র শুধু মন, স্থূল-সূক্ষ্মের মাঝামাঝি এক কুজ্‌ঝটিকাময়প্রহেলিকাচ্ছন্ন জগৎ। পরিণামে অসরলতা, সংকীর্ণতা, অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা, স্বার্থপরতা, কপটতা। পুরোহিততন্ত্রে তাই জ্ঞানের সর্বজনীন

বিকাশের পথ রুদ্ধ, বিদ্যাচর্চা এক ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।[১২] ক্রমে পুরোহিতদের ভালো গুণগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তপস্যা সংযম ত্যাগ সত্যানুসন্ধানের বদলে প্রকট হয়ে ওঠে অন্নসংগ্রহের উদগ্র প্রবৃত্তি, আধিপত্য বিস্তারের নগ্ন আকাঙ্ক্ষা।[১৩] বিদ্যাহীন পুরুষকারহীন পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল পৈতৃক অধিকার সম্মান ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে যেন তেন প্রকারেণ চেষ্টা করে। ফলে সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে সংঘাত ও পরিণামে আধিপত্য লোপ।[১৪] অবস্থার চাপে অনেকে পূর্বপুরুষদের পেশা বদলায়, তাদের পূর্বতন প্রতিষ্ঠা আর থাকে না।[১৫] পুরোহিত যেমন সমস্ত বিদ্যা কেন্দ্রীভূত করতে সচেষ্ট, ক্ষত্রিয় রাজা তেমনি সমস্ত পার্থিব শক্তি নিজের আয়ত্তাধীন রাখতে চান। সমাজের শৈশবাবস্থায় এর উপকারিতাও আছে। রাজ্যের পরিচালনক্ষমতা একজন বা কয়েকজনের হাতে থাকে, কিন্তু শিক্ষার আপেক্ষিক প্রসার হয়।[১৬] ক্ষত্রিয়শাসনে পার্থিব শক্তির বিকাশ, ভোগের ইচ্ছার পুষ্টি এবং ভোগসহায়ক বিদ্যার সৃষ্টি ও উন্নতি। তাই এই পর্যায়ে আমরা দেখি সূক্ষ্মকলাবিদ্যাদির চর্চা, নগর সভ্যতার অভ্যুদয়। কুঁড়ে ঘরের স্থান নেয় সুরম্য অট্টালিকা, গ্রাম্য সংস্কৃতির জায়গা নেয় সুকুমার শিল্প, মধুর সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য। প্রথম দিকে পুরোহিত শাসনের মতো সৈনিক শাসনও লোকহিতকর, সামাজিক উন্নতির অনুকূল। কিন্তু ক্রমেই তার নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্রী চেহারা প্রকট হয়ে পড়ে।

ক্ষত্রিয় রাজার চরিত্রে পশুরাজ সিংহের দোষগুণ দুই-ই দেখা যায়। প্রজারা রাজসিংহের ভোগের আকাঙ্ক্ষার বাধা হয়ে দাঁড়ালেই তাদের সর্বনাশ, রাজার আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেই তারা নিরাপদ। আদর্শ রাজা প্রজাদের পিতামাতা, নিজের সন্তানের মতো তিনি প্রজাদের পালন করবেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে রাজা তাঁর কর্তব্য ভুলে যান, নিজের ওপর দেবত্ব আরোপ করেন, রক্ষকের বদলে হন ভক্ষক, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক বিচ্ছেদ ঘটে। রাজশক্তির অসংযম ও স্বেচ্ছাচারিতায় রাজা প্রজা উভয়েই হীন থেকে হীনতর অবস্থায় নেমে আসে।[১৭] এর পর বৈশ্য বা বণিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য। জ্ঞান বা অস্ত্র নয়, বৈশ্যের শক্তি টাকা। তার ভ্রূকুটিতে 'থরথরি রক্ষনাথ কাঁপে লঙ্কাপুরে'। তার হাতে সোনার থলি, মহারাজ থেকে ভিক্ষুক পর্যন্ত সবাই মাথা নিচু করে তার পেছনে ছুটছে। 'যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়।...কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তিসঞ্চার হয়—বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই।'[১৮]

কিন্তু বৈশ্যশাসনের একটি ভালো দিকও আছে। বণিক নিজে লেখাপড়া বিশেষ জানে না, কিন্তু ব্যবসার স্বার্থে তাকে দেশ-দেশান্তরে যেতে হয়, তার ফলে আজ সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসারিত হয়েছে। 'যে বিদ্যা, সভ্যতা ও কলা-বিলাসরূপ রুধির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ-হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনীযোগে তাহা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। এ বৈশ্য-প্রাদুর্ভাব না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্য-ভোজ্য, সভ্যতা বিলাস, বিদ্যা, অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত ?'[১৯] 'যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তান্তরে বার্ত্তা বহন করিতেছে মহাচলের ন্যায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দ্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্য দেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাট্-কুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্ব্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।'[২০] সামাজিক বিকাশের শেষ পর্যায়ে আসবে শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য।[ক] শ্রমিকশাসনে সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার হবে, সকলের জন্যে জাগতিক সুখসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু হয়ত সংস্কৃতির মান নেমে যাবে, অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ক্রমশই কমতে থাকবে।[২১] এই আলোচনায় দেখা যায়, প্রত্যেক পর্যায়েই ভালো-মন্দ শুভ-অশুভ হিতকর-অহিতকর দুই-ই আছে। এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা কি গড়ে তোলা সম্ভব যেখানে পুরোহিতের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় সংস্কৃতি, বৈশ্যাধি-কারের বিদ্যার প্রসার, এবং শূদ্রশাসনের সাম্যবাদের সমন্বয় হবে ? প্রত্যেক বর্ণের শাসনের খারাপ দিক বাদ দিয়ে শুধু ভালো দিক নিয়ে এক আদর্শ সৌধ কি নির্মাণ করা যায় ? সেটা কি সম্ভব ? মার্কিন তরুণী মেরী হেলকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজি এই প্রশ্নটি তুলেছেন।[২২]

ক. মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে বিবেকানন্দ 'শ্রমিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, বন্ধনীর মধ্যে লিখেছেন 'শূদ্র'। অর্থাৎ স্বামীজির দৃষ্টিতে জাতিগত (বা বৃত্তিগত) বর্ণ ও অর্থনৈতিক শ্রেণী প্রায় সমার্থক।

উল্লেখপঞ্জী :

১. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৯, ১৯৪, ১৯৬, ২১৩।

২. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৮ ; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

৩. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১২৯।

৪. ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১২-১৩।

৫. তদেব, পৃ. ১২৭ ; সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪০৭।

৬. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৬।

৭. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮০-৮১ ; 'বর্তমান ভারত', পৃ. ১৪, ১৮।

৮. তদেব ; 'বর্তমান ভারত', পৃ. ১৭।

৯. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৩৪-৩৫।

১০. তদেব, পৃ. ১৯-২০।

১১. তদেব, পৃ. ১৯।

১২. তদেব, পৃ. ২০-২২।

১৩. তদেব, পৃ. ২২।

১৪. তদেব।

১৫. তদেব, পৃ. ২৪-২৫। 'নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরাও ইংরাজী পড়িয়া রাজকর্মচারী হইতেছে, অথবা বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে। টোলের অধ্যাপকেরা সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈদ্য কায়স্থাদির বৃত্তি অবলম্বন করাইতেছেন। ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে চিতা নির্মাণ করাই প্রধান কর্তব্য।'

১৬. ইংরেজি রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮১ ; 'বর্তমান ভারত', পৃ. ২৮-২৯।

১৭. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ২৬-২৮ ; ৩৩।

১৮. তদেব, পৃ. ৩৪-৩৫।

১৯. তদেব, পৃ. ৩৫-৩৬।

২০. তদেব, পৃ. ১৭।

২১. ইংরেজি রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৩৮১।

২২. তদেব।

শূদ্রের প্রাধান্য : সমাজতন্ত্র

মেরী হেলকে লেখা এই চিঠিতে স্বামীজি বলেছেন, সমাজে বিভিন্ন শাসনপদ্ধতি পরীক্ষা হয়েছে, দেখা গেছে সব পদ্ধতিই ত্রুটিপূর্ণ। এখন শ্রমিকশ্রেণীর দিন আসছে। তাদের অভ্যুদয় কেউ রোধ করতে পারবে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে। এ ব্যবস্থা পাল্টানো দরকার। শূদ্রদের, শ্রমিকদের এবার সুযোগ দিতে হবে। স্বামীজি বলেছেন, আমি সমাজতন্ত্রবাদী। সমাজতন্ত্রকে আমি নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ বলে মনে করি না, কিন্তু আমার মতে অভুক্ত থাকার চেয়ে আধখানা পাউরুটিও ভালো।[১] 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে শূদ্র তার শূদ্রত্ব বজায় রেখেই সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে। 'তাহারই পূর্ব্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ (সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ) প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'[২] শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছেন ; সকল দেশেই ঐ রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।[৩]

শূদ্রের শারীরিক শ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য, বৈশ্যের ধনধান্য। কিন্তু তাদের নিজেদের অবস্থা কি ? তারাই সমাজের আসল শরীর, আর সবদেশে সবকালে তারা 'জঘন্য প্রভবো হি সঃ' বলে অভিহিত। ভারতে তারা 'চলমান শ্মশান', অন্যদেশে তারা 'ভারবাহী পশু'।[৪] আমরা অদ্বৈতবাদ প্রচার করি, কিন্তু

মেথর ধাঙর অন্ত্যজদেরক প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করি।[৫] ভারতে এমন সময় ছিল যখন অন্ত্যজেরা লেখাপড়া শিখতে চাইলে তাদের জিব কেটে নেওয়া হত।[৬] এদেশে দরিদ্রদের একটা বড় অংশ যে ধর্মান্তর গ্রহণ করে ছ, তার কারণ জমিদার ও পুরোহিতদের অত্যাচার।[৭] যারা টাকার গদির ওপর বসে আছে, সমাজে যাদের উঁচু আসন, তাদের পক্ষে বর্তমান অবস্থা মেনে নেওয়া সহজ। কিন্তু যারা লেখাপড়া শিখেছে, লক্ষ লক্ষ পদদলিত শ্রমজীবীর রক্ত শুষে বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছে, তারা যদি এই দরিদ্র মানুষদের কথা না ভাবে, তবে তারা কৃতঘ্ন।[৮] ভারতে গরিবরা কুকুরের মতো মরছে [৯] এদেশে ধনী, অভিজাতশ্রেণী, পুরোহিত ও রাজারা কখনোই এদের জন্যে চিন্তা করেনি অথচ এদের পেষণ করেই তাদের সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা। আর তাই ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের অমোঘ খড়্গ ধনী ও উঁচু শ্রেণীর ওপর নেমে এসেছে। বিদেশীরা তাদের ঐশ্বর্য লুঠ করেছে, মেয়েদের ইজ্জৎ কেড়ে নিয়েছে, তাদের সম্মান পায়ের নিচে মাড়িয়ে দিয়েছে।[১০] স্বামীজী বলেছেন, দেশ ও জাতির প্রাণকেন্দ্র দরিদ্রের কুটির।[১১] দরিদ্র মানুষকে আমরা অবহেলা করেছি, এটা জাতীয় পাপ। তাদের শোষণ করে আমাদের শিক্ষা, তাদের শ্রমে তৈরি হয়েছে আমাদের মন্দির, আর তারা ক্রীতদাসের মতো বেঁচে আছে, তাদের ভাগ্যে আছে শুধু পদাঘাত। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, দেখতে হবে যেন তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় [১২] বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, দরিদ্র মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি, যারা বঞ্চিত নিগৃহীত তারা সবাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি।[১৩] ঈশ্বরজ্ঞানে তাদের সেবা করতে হবে।[১৪] ভারতের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা আজ শারীরিক ও নৈতিক দু' অর্থেই মৃত, একমাত্র আশা দরিদ্র জনগণ।[১৫] গরিবরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কাজ করেছেন।[১৬] রাজতন্ত্রের দিন চলে গেছে, এখন জনগণরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণীর অত্যাচার সবচেয়ে খারাপ।[১৭]

ক. স্বামীজি বলেছেন, তাঁকে শূদ্র বললে তাঁর কোন দুঃখ নেই, তাতে তাঁর পূর্বপুরুষদের পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। তিনি এমন একজনের শিষ্য যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েও একজন অন্ত্যজের শৌচাগার পরিষ্কার করেছিলেন। সে বেচারী ছোট জাত, একজন ব্রাহ্মণকে তার বাড়ি পরিষ্কার করতে কি করে দেবে! তাই রামকৃষ্ণ মাঝরাতে গোপনে তার বাড়ি ঢুকে দিনের পর দিন তার পায়খানা পরিষ্কার করতেন। 'তাঁর পা আমার মাথায়, তিনি আমার গুরু, আমি তাঁর জীবন অনুসরণ করতে চেষ্টা করব।' এটাই সমাজসংস্কারের পথ, দরিদ্র মানুষের দাস হয়ে তাদের ওপরে টেনে তুলতে হবে, বিদেশী ভাবধারা নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিলে হবে না। (ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড-পৃ. ২১১-১২।)

অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার ছবি স্বামীজি এঁকেছেন নিপুণ চিত্রকরের মতো। সে ছবিতে আছে দিব্যপ্রেরণার দ্যুতি আর ঐতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও দূরদৃষ্টি।

> …নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।…বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারে…অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও।[১৮]

উল্লেখপঞ্জী :

১. বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮১।
২. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৩৮।
৩. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১০৮।
৪. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৩৬।
৫. ইংরেজি রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৫।
৬. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৩৬।
৭. ইংরেজি রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩০।
৮. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।
৯. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬১।
১০. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩০।
১১. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৯।
১২. তদেব, পৃ. ২২২-২৩।
১৩. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১০।
১৪. তদেব, পৃ. ২৪৬।
১৫. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০৬।
১৬. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, ৪৪৫।
১৭. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১৫।
১৮. 'পরিব্রাজক'।

বর্ণভেদ : জন্মগত ও গুণগত

ভারতের অন্ত্যজ মানুষ দু'ধরনের অসাম্যের শিকার হয়েছে: দারিদ্র্য ও বর্ণ-ভেদ। এই দুইয়েরই ভিত্তি যে অর্থনৈতিক সে ইঙ্গিত স্বামীজি দিয়েছেন। দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তিনি বারবার বলেছেন, কিন্তু এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ওপর। এই ঐক্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বর্ণভেদ। এককালে বর্ণভেদ প্রথার আপেক্ষিক উপযোগিতা ছিল, বিজাতীয় ধর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রথা এক ধরনের বর্মের কাজ করেছে, হিন্দুসমাজকে স্থায়িত্ব দিয়েছে।[১] কিন্তু এর কাজ হয়ে গেছে, এখন এর পূতিগন্ধ দেশের পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে।[২] ভারতের পতনের কারণ এই বর্ণ বৈষম্য। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ দুর্বল হয়ে গেছে, বিদেশীদের দখলে চলে গেছে।[৩] সমাজে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য ও অনৈক্য তার সবচেয়ে বড় কারণ এই বর্ণভেদ প্রথা। এই চাতুর্বর্ণ্য জৈবিক শৃঙ্খলের মূল শিকড়, মায়ার মূল শিকড়।[৪] আমাদের দেশে কেউ নিচু জাতে জন্মালে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্য সবাই ভুলে গেছে, ধর্ম এখন নেমে এসেছে ছোঁয়াছুঁয়িতে।[৫]

> …ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নেই হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না, ছোঁব না', ব'লে এদের আমরাই হীন ক'রে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে।[৬]
>
> তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে। অপর জাতির ছোঁয়া ভাতটা না খেলেই যেন ভগবান-লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের মহান সত্যসকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই মারামারি চলছে।[৭]
>
> তুই যদি একটা লোককে খেতে-শুতে-বসতে সর্বক্ষণ বলিস, 'তুই নীচ, তুই নীচ' —তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে, 'আমি সত্য-সত্যই নীচ'।[৮]
>
> টাকা দিতে পারলেই ভট্‌চাজের দল যা-তা বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন![৯]

প্রথমে…সমস্ত হিঁদুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। …সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে।[১০]

২

চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা হিন্দুসমাজে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা সমাধানের পথ কি? স্বামী বিবেকানন্দ এখানে সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে একমত হননি। তাঁর মতে, সংস্কারকেরা দ্বিবিধ ভুল করেছেন। চাতুর্বর্ণ্য সামাজিক প্রথা, শাশ্বত হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় পর্যন্ত সবাই একে ধর্মীয় প্রথা হিসেবে গণ্য করেছেন, এবং বর্ণ ও ধর্ম একসঙ্গে লোপ করার চেষ্টা করেছেন। এটাই তাঁদের ব্যর্থতার কারণ।[১১] সংস্কারকদের অনেকে বিদেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবে দেশের সব কিছুরই সমালোচনা করেছেন, এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুরোপুরি বর্জন করতে চেয়েছেন। এই পথে সমাজের সংস্কার করা যাবে না।[১২] দেশের ঐতিহ্যের কাঠামোর মধ্যেই সংশোধন, সংস্কার ও পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে, তবেই দেশের লোক তা মেনে নেবে।[১৩] বিদ্যাসাগর এটা বুঝেছিলেন, আর তাই হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেই বিধবা-বিবাহের সমর্থন খুঁজেছিলেন[১৪] তাই স্বামীজি চাতুর্বর্ণ্য প্রথার কাঠামো বজায় রেখেই বর্ণবৈষম্য দূর করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ স্তরে বর্ণভেদ স্বীকার করা হয় নি[১৫] আত্মার কোন বর্ণ নেই।[১৬] মহাভারতে আছে যে সত্যযুগে একটিমাত্র বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ। তারপর পেশার বিভিন্নতা অনুযায়ী বর্ণবিভাগ হল। সত্যযুগে আবার সবাই এক বর্ণে ফিরে যাবে। এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। সুতরাং বর্ণভেদ সমস্যার সমাধান করতে হলে উঁচু বর্ণকে নিচে নামিয়ে আনলে হবে না সবাইকে ব্রাহ্মণ করতে হবে। ব্রাহ্মণত্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সেই আদর্শকে তুলে ধরতে হবে।[১৭] কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালেই কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণত্ব বংশানুগতিতে পাওয়া যায় না, ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয়।[১৮] ব্রাহ্মণ বর্ণ ও খাঁটি ব্রাহ্মণত্ব আলাদা। ভারতে এখন যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছে সেই ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়, কিন্তু পশ্চিমে ব্রাহ্মণত্ব গুণগত। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের তারতম্য অনুযায়ী বর্ণ। প্রত্যেক লোকের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গুণ রয়েছে। যখন সে টাকা নিয়ে কারও অধীনে কাজ করছে, তখন সে শূদ্র। যখন সে লাভের জন্যে ব্যবসা করছে, তখন সে বৈশ্য। যখন সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তখন সে ক্ষত্রিয়। যখন সে ঈশ্বরের ধ্যান করছে অথবা

ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা করছে তখন সে ব্রাহ্মণ। বর্ণান্তর খুবই স্বাভাবিক। না হলে বিশ্বামিত্র কিভাবে ব্রাহ্মণ হলেন, আর পরশুরাম কিভাবে ক্ষত্রিয় হলেন?[১৯] স্বামীজি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর পুত্র ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ ও কর্ণ বিদ্যা বা বীরত্বের জোরে ব্রাহ্মণত্বে ও ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীতক হয়েছিলেন।[২০] বেদে আছে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি রক্ষাকর্তা তিনিই ক্ষত্রিয়। ব্যবসা যাঁর জীবিকা তিনিই বৈশ্য। কর্মবিভাগ থেকে এই সামাজিক বিভাগ কালক্রমে বংশানুগত অনড় বর্ণ-ভেদে রূপান্তরিত হল, সংগঠিত পুরোহিতকুল জাতির ঘাড়ে চেপে বসল।[২১] সৃষ্টির মূল কথা এক থেকে বহু, ঐক্য ও বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে খাঁটি বর্ণভেদে ফিরে যেতে হবে, কৃত্রিম বর্ণভেদ শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্যক্তির নিজস্ব প্রকৃতি তার আসল বর্ণ। সুতরাং বর্ণভেদ লোপ পেলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বর্ণ জন্মসূত্রে পাওয়া যায়। পুরুষপরম্পরায় পাওয়া বর্ণকে মেনে নেওয়ার অর্থ ব্যক্তির নিজস্ব প্রকৃতিকে অস্বীকার করা, প্রকৃত বর্ণকে অস্বীকার করা। জন্মগত বর্ণভেদ এদেশে এক বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে, ভারতের পতনের এটাই প্রধান কারণ। য়ুরোপ ও আমেরিকার উন্নতির কারণ গুণগত বর্ণবিভাগ। এর ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ হয়েছে, ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। বৈচিত্র্য মানে অসাম্য নয়, এই বৈচিত্র্য বিশেষ সুবিধা-ভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করে না।[২২] স্বামীজি বলেছেন, ভ্রান্তি থেকে আমরা সত্যে পৌঁছই না, সত্যের নিচু স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছই।[২৩] তাই এদেশে যে প্রথা চলে এসেছে তা বিলোপের চেষ্টা করা বোকামি হবে। চাতুর্বর্ণ্য প্রথা মেনে নিয়েই আমাদের নতুন ভিত্তিতে সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। সেই ভিত্তি হবে জন্মগত বর্ণভেদের বদলে গুণগত বর্ণভেদ।[২৪] জ্যোতিষশাস্ত্রেও এটা স্বীকৃত[২৫] কিন্তু স্বামীজির একথাও মনে হয়েছে যে জন্মগত বর্ণভেদের মতো গুণগত বর্ণভেদও শৃঙ্খল, মায়া। তবে হয়ত ঐহিক স্তরে মানুষে মানুষে পার্থক্য ও এক ধরনের বর্ণ-ভেদ থাকবেই।[২৬] প্রায় সব দেশেই জাতিভেদ বর্ণভেদ রয়েছে। আর যদি বর্ণ-

ক। এখানে স্বামীজি একটা প্রশ্ন তুলেছেন। জন্মগত বর্ণভেদের বদলে গুণগত বর্ণভেদ ভাল—সেই বর্ণভেদই স্বামীজি সমর্থন করেছেন—কিন্তু তাতেও গরিবদের, শূদ্রদের কতটুকু কল্যাণ হবে? শূদ্রদের মধ্যে অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু তাতে সমগ্র শূদ্রসমাজ উন্নীত হবে না। গুণগত বর্ণভেদ আপেক্ষিকভাবে হিতকর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শূদ্রেরা শূদ্রত্ব বজায় রেখেই সামগ্রিকভাবে উন্নততর স্তরে পৌঁছবে। ('বর্তমান ভারত', পৃ. ৩৮-৩৯)

ভেদ পুরোপুরি দূর করা নাই যায়, তবে ডলার-কৌলীন্যের চেয়ে আদর্শগত কৌলীন্যই শ্রেয় – উচ্চবর্ণের মাপকাঠি হবে পবিত্রতা, ধীশক্তি, ত্যাগ।[২৭] বর্ণ থেকে বর্ণহীনতায় পৌঁছতে হবে, সমাজের সবাইকে খাঁটি ব্রাহ্মণ করতে হবে।[২৮] এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তাঁদের লোকশিক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে হবে, বর্ণাভিমান ত্যাগ করতে হবে। প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের কথা তাঁদের মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শাস্ত্রানুযায়ী খাঁটি ব্রাহ্মণত্ব তাঁরা হারিয়েছেন।[২৯] কৃত্রিম বর্ণভেদ সমাজে যে আবিলতা সৃষ্টি করেছে তা দূর করতে স্বামীজি লোকশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। অসবর্ণ বিয়ের কথাও বলেছেন।[৩০] ইংরেজশাসনে শিক্ষার কিছুটা প্রসার হয়েছে এবং বণিকসভ্যতা ভারতে প্রবেশ করেছে, এর ফলে বর্ণভেদের সংস্কার চলে যাচ্ছে।[৩১] দেশের ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে লক্ষ্যের দিকে আমাদের এগোতে হবে। সেই লক্ষ্য আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। আদর্শ ব্রাহ্মণ অহিংস, শান্ত, স্থির, পবিত্র, ধ্যানমগ্ন।[৩২] বিদেশীরা এই মিথ্যা প্রচার করেছে যে শূদ্রেরা অনার্য।[৩৩] আসলে সব হিন্দুই আর্য, শূদ্রেরা শিক্ষার্থী বা সম্ভাব্য আর্য।[৩৪] সত্যযুগের আদি বর্ণে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।[৩৫] স্বামীজি বলেছেন, ইসলাম ধর্মের ভিত্তি সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ। একজন লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা মাত্র সমস্ত মুসলমান সমাজ তাকে সাদরে ভাই বলে অভ্যর্থনা করবে।[৩৬] যিশু খ্রিস্টের বাণীও সাম্যের বাণী।[৩৭] কিন্তু প্রচলিত খ্রিস্টধর্মে এই সাম্যবোধ নেই : 'আমি এখনও এমন একটি গির্জাও দেখিনি যেখানে শ্বেতকায় ও নিগ্রো পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে পারে।'[৩৮] আমেরিকায় নিগ্রোদের দুরবস্থার কথা স্বামীজি বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন।[৩৯] তিনি এক সময়ে আশা করেছিলেন যে আমেরিকা একদিন শূদ্রদের সমস্যার সমাধান করবে – স্বাধীনতা ও সহযোগিতার আদর্শ সেদেশে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে [৪০] কিন্তু পরে তাঁর আশা ভেঙে যায়, তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে আমেরিকা দ্রুত একনায়কত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে।[৪১] শিল্প বিকাশ, আধুনিক শিক্ষাব প্রসার ও গণতন্ত্র বর্ণবৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে, কিন্তু স্বামীজির মতে এই মৌল সমস্যার মৌল সমাধান চাই। সে সমাধান, আত্মজ্ঞান। সাধারণ মানুষের মধ্যে বেদান্তের আত্মজ্ঞানের তত্ত্ব প্রচার করতে হবে।[৪২] সবাইকে বোঝাতে হবে যে প্রত্যেকের মধ্যেই সুপ্ত ব্রাহ্মণত্ব রয়েছে, সেই ব্রাহ্মণত্ব জাগাতে হবে। এই কাজে এগিয়ে আসার জন্যে স্বামীজি ব্রাহ্মণদের আহ্বান করেছেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে যে একমাত্র সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই এই শিক্ষার ভার নিতে পারেন।[৪৩]

উল্লেখপঞ্জী :

১, বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

২. তদেব, পৃ. ২২-২৩।

৩. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৪২।

৪. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।

৫. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭।

৬. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৭৮।

৭. তদেব, পৃ. ১৫৩।

৮. তদেব, পৃ. ১৫৫।

৯. তদেব, পৃ. ১৫৬।

১০. তদেব, পৃ. ১৭৭।

১১. ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২।

১২. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৪, ২১৫।

১৩. তদেব, পৃ. ২১২-১৩।

১৪. ভগিনী নিবেদিতা, *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda* (Sixth Edition), পৃ. ৩২।

১৫. ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১-২২।

১৬. তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

১৭. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৩-৯৪।

১৮. তদেব, পৃ. ১৯২।

১৯. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

২০. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৩৯।

২১. ইংরেজি রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৮।

২২. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭২-৭৩।

২৩. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২০২।

২৪. তদেব, পৃ. ২১৪-১৫।

২৫. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

২৬. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।

২৭. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

২৮. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১৪-১৫।

২৯. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৭, ৩৪০, ৪৬১ ।

৩০. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৪১ ; তৃতীয় খণ্ড, ৫৩৫ ।

৩১. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৩ ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১৫৫ ।

৩২. ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৮ ।

৩৩. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৫৩ ।

৩৪. ইংরেজি রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩০১ ।

৩৫. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩১ ; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৩ ।

৩৬. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩ , দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭১ ।

৩৭. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৬ ।

৩৮. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭১ ।

৩৯ তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৪ , দ্বিতায় খণ্ড, পৃ. ৩৭১ ।

৪০. ভগিনী নিবেদিতা, *Notes of Some Wanderings*, পৃ. ২১ ।

৪১. শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত, *Letters of Sister Nivedita*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬২ ।

৪২. ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৩, ২২৪ ।

৪৩. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩ , পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৭ ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি : সমাজতন্ত্র কি মায়া ?

বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্যে বিবেকানন্দ জন্মগত বর্ণভেদের বদলে গুণগত বর্ণভেদের কথা বলেছেন। এর ফলে প্রত্যেক লোকের নিজস্ব প্রকৃতির স্ফূর্তির পথে সব বাধা দূর হবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক বিকাশ হবে।[১] হিন্দুসমাজে জন্মগত বর্ণের শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার প্রবণতা চেপে রেখেছে, এবং তার ফলে আমাদের দেশ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিচে নেমে গেছে, বিজাতীয় শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে। প্রত্যেক ভারতীয় জানে যে সে সমাজের দাস, তার ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বিত। এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ হয়নি। স্বাধীনতা না থাকলে বিকাশের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়েছে, জীবন-সংগ্রামের চাপে বর্ণাশ্রম লোপ পাচ্ছে। উত্তরভারতে অনেক ব্রাহ্মণ এখন দোকানের মালিক, জুতোর কারখানার মালিক, অনেকে মদ তৈরির ব্যবসাও করছে। জীবিকার জন্যে সবাই স্বাধীনভাবে পেশা বেছে নিচ্ছে, নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী সফলতার শিখরে পৌঁছচ্চে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন আর কাউকে বেঁধে রাখতে পারছে না।[৩] মৃণালিনী বসুকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে এদেশে এক নিয়মানুগ রীতিবদ্ধ সমাজ তৈরি হয়েছে, এই নিয়মানুবর্তিতা এক অনন্য সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু নিয়মতন্ত্রের নাগপাশে জীবনের প্রাণস্পন্দন থেমে গেছে, লোকেরা জীবনীশক্তিহীন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা যদি গুণ হয়, তবে গাছ সবচেয়ে বড় ধার্মিক, রেলওয়ে এঞ্জিন সবচেয়ে বড় সাধু।[৪] ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতার ভাল দিকগুলো স্বামীজি এখানে তুলে ধরেছেন। কিন্তু অন্যত্র তিনি বলেছেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও প্রতিযোগিতা, অন্য সবাইকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে জীবনসংগ্রামে জয়লাভের চেষ্টা — যা পশ্চিমী সভ্যতায় বিশেষভাবে প্রকট — পাশবিক প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। মনুষ্যত্বের সাধনা প্রতিযোগিতায় নয়, সহযোগিতায়, আত্মত্যাগে।[৫]

> ইউরোপের উদ্দেশ্য — সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য — সকলকে আমাদের সমান ক'রব, আমাদের চেয়ে বড় ক'রব।... ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।[৬]

এই নৈতিক বোধের জন্যে ভারতকে অনেক দাম দিতে হয়েছে, জাগতিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পাশবিক শক্তির জোরে, রক্তপাতের পথে ঐহিক উন্নতি লাভ করেছে, কিন্তু ভারত সে পথে যায়নি। তার ফলে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' এই প্রাকৃতিক নিয়মে ভারত পিছিয়ে পড়েছে।[৭] মানুষের সামনে দুটো পথ : একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা, অন্য সবাইকে হটিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ ; আর একদিকে সহযোগিতার আদর্শ, সমষ্টির উন্নতির জন্যে ব্যষ্টির আত্মত্যাগ।[৮] কোন্ পথ মানুষ বেছে নেবে ? এই দুয়ের সমন্বয় কি সম্ভব? সমন্বয়ের কথা বিবেকানন্দ বলেছেন।[৯] কিন্তু তাঁর চেতনায় যে আদর্শ ভাস্বর তা সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তির আত্মবিসর্জন।

> ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই ![১০]

> তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে ? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ।[১১]

এই জীবনবোধ থেকেই সাম্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, অসাম্য পাপ।[১২] তাঁর মতে মানুষের দুঃখের তিনটি কারণ : অজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা, অসাম্য।[১৩] তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে সমাজ-তন্ত্র, জনগণরাজ, শূদ্রাধিপত্য আসছে।[১৪] 'এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে।'[১৫] স্বামীজি যে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলেছেন, তার চারটি দিক আছে : আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক। বৈদান্তিক দৃষ্টিতে ছোটবড় সমস্ত প্রাণী ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, পার্থক্য শুধু আবরণে। অদ্বৈতবাদের বাণী সাম্যের বাণী : অদ্বৈতবাদী বিশেষ অধিকার, ছোটবড় মানেন না, মানুষে মানুষে ও বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে প্রভেদ মানেন না।[১৬] সব অন্তরায় দূর করা, বিশেষ অধিকারের দেয়াল ভেঙে ফেলা অদ্বৈত-বাদের শ্রেষ্ঠ অবদান।[১৭] সমস্ত সাম্যবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি বেদান্ত।[১৮] সামাজিক ক্ষেত্রে, সাম্যবাদী ও সমাজবাদী চিন্তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী। মৃণালিনী বসুকে লেখা চিঠিতে বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের আদর্শ সমাজতন্ত্র, আর য়ুরোপের আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্ক প্রত্যেক সমাজের চির-কালীন সমস্যা। ব্যক্তিস্বাধীনতা কি ভাল ? ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্র কতদূর প্রসারিত

হতে পারে ? সমষ্টির স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা ও সুখ কি বিসর্জন দেওয়া উচিত ? স্বামীজি বলেছেন, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির চেয়ে সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়, আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ব্যক্তির মূল্য স্বীকৃত। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তিমানসের সার্বিক বিকাশ হতে পারে না, আর নিয়মতন্ত্র মৃত্যুর সামিল। তবে এটাও ঠিক যে বহুর সুখের জন্যে আত্মস্বার্থ বিসর্জনের চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। কিন্তু এই ত্যাগ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হলে তার কোন দাম নেই। আত্মত্যাগ তখনই সার্থক যখন তা ব্যক্তির অন্তরপ্রকৃতির তাগিদ থেকে উৎসারিত।[১৯] ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্কের আর এক দিক শাসক ও শাসিত, রাজা ও প্রজার সম্পর্ক। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাঁহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।'[২০] রাজা যখন এই সত্য ভুলে যান, শক্তির প্রমত্ততায় যখন প্রজাপালকের বদলে প্রজাপীড়ক হয়ে ওঠেন, তখনই রাজা-প্রজায় সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাজশক্তির মৃত্যুবীজ স্বেচ্ছাচারে।[২১] 'ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্ শাসনকারীদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।'[২২] বারবার এ বিপ্লব হয়েছে, ভারতেও হয়েছে, তবে ধর্মের নামে।[২৩] ফরাসী বিপ্লব এই সংঘাতেরই আধুনিক রূপ :

> তখন রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন…দোষী কি নির্দোষ, তার আর জিজ্ঞাসা-পড়া নেই, একেবারে নিয়ে পুরলে সেই বাস্তিলে ; সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না।…দেশশুদ্ধ লোক এ সব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠল, 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা', 'সব সমান', 'ছোট বড় কিছুই নয়'—এ ধ্বনি উঠালো… বললে, 'দুনিয়াসুদ্ধ লোক, তোমরা ওঠ, রাজা-ফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল ক,

ক। ফরাসী বিপ্লবের প্রসঙ্গে স্বামীজি গীতার শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী (৪।৮) উল্লেখ করেছেন :

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃ. ৯২)

সব প্রজা স্বাধীন হোক, সকলে সমান হোক !'[২৪] ...এই ফ্রাঁস স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারি নগরী হ'তে ইউরোপ তোলপাড় ক'রে ফেলেছে, সেই দিন হ'তে ইউরোপের নূতন মূর্তি হয়েছে।[২৫]

বিবেকানন্দ বলেছেন, সামাজিক বিধানের ভিত্তি অর্থনীতি।[২৬] মানুষের জৈবিক সত্তা প্রধানত অর্থনীতির প্রভাবাধীন।[২৭] ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বেরও অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে। একটা দেশের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা অল্প কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত ; তারা কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের ওপর প্রভুত্ব করে। সব কিছুই তাদের পদানত। পশ্চিমী দুনিয়া শাসন করছে মুষ্টিমেয় চশমখোর কয়েকটি ধনী – নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, স্বাধীনতা, পার্লামেণ্ট – সবই তামাশা।[২৮] একটা দেশ মানে অল্প কয়েকজন বড়লোক নয়।[২৯] সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষত্রুটি আছে, কিন্তু সে ব্যবস্থায় সম্পদের, স্বাচ্ছন্দ্যের সমবণ্টন হবে।[৩০] এটা সত্যি যে আমাদের দেশে সুযোগসুবিধা কম, কিন্তু সম্পদ যা আছে তাতে ভালভাবে সব লোকের খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা করা যায়, তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখা যায়।[৩১]

স্বামী বিবেকানন্দ সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে সব মন্তব্য করেছেন, সেগুলি ভালভাবে অনুধাবন করা দরকার, অতিসরলীকরণ করলে তাঁর জীবনবোধের পুরো চেহারাটা আমরা দেখতে পাব না। তিনি সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন, কিন্তু একথাও বলেছেন যে পৃথিবীতে পরিপূর্ণ সাম্য কখনোই আসবে না তাঁর মতে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধ্বনি এক অর্থে অন্ধ গোঁড়ামি। সৃষ্টি মানেই বহুত্ব, বৈচিত্র্য। পরিপূর্ণ সাম্যের অর্থ মৃত্যু, সৃষ্টির বিনাশ। সব লোকের শারীরিক ক্ষমতা এক নয়, বুদ্ধি ও মেধা এক নয়। কেউ পুরুষ, কেউ মেয়ে। কারও গায়ের রঙ সাদা. কেউ কালো। আমরা সবাই মানুষ, কিন্তু প্রত্যেকে অনন্য। সবাই সমান এটা পাগলের কথা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা পৃথিবীতে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করব না। সৃষ্টির মূল কথা ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য। বৈষম্য থাকবেই, আবার বৈষম্য দূর করার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বর পরম এক, সেই অখণ্ড সত্তায় আমরা সবাই সমান। তাই সাম্যের আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে এত বেশি। সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হবে, আবার এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে অখণ্ড সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। তাই কারও ওপর কোন মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, প্রত্যেকের স্বাধীন সত্তাকে মর্যাদা দিতে হবে।[৩২] স্বামীজি বলেছেন, সমষ্টি বা সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্বই অসম্ভব, কিন্তু

তিনি যান্ত্রিক নিয়মের শ্বাসরোধকারী শৃঙ্খল সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে সমাজতন্ত্র আসছে, সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য এক অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু তিনি একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে চেতনার উঁচু স্তর থেকে বিচার করলে সমাজতন্ত্রও মায়া।[৩৩] সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক অপূর্ণতা থাকবে, কিন্তু এটা অন্তত একটা অভিনব পরীক্ষা হবে, সুখদুঃখের নতুন বণ্টন হবে।[৩৪] কিন্তু স্বামীজির মতে ধর্মের ভিত্তি ছাড়া সমাজতন্ত্র টিকবে না। শুধু সমাজতন্ত্র নয়, কোন সভ্যতাই টিকবে না।[৩৫] মানুষকে ভাল হতে হবে, আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। বৈদান্তিক চিন্তার আলোকে সমাজকে গড়ে তুলতে হবে।[৩৬] একমাত্র ধর্মের মধ্য দিয়েই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে পারে।[৩৭] প্রত্যেক মানুষই ব্রহ্ম[খ] এই পরম বোধিতে পৌঁছতে হবে। শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে জীবনের মৌলিক পরিবর্তন হবে না।[৩৮] সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব প্রচারের আগে আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রসার চাই।[২৯] আধ্যাত্মিক প্রগতি না হলে সামাজিক সংস্কার সার্থক হবে না।[৪০] ঐহিক স্তরে আপেক্ষিক অর্থে সমাজতন্ত্র কল্যাণপ্রদ—সাধারণ মানুষ তাদের জৈব প্রয়োজন মেটাতে চায়, আরও বেশি খাদ্য চায়, শ্রমের ভার লাঘব করতে চায় (স্বামীজি বলেছেন, ভবিষ্যতে শূদ্রবর্ণ থাকবে না, শূদ্রদের কাজ যন্ত্র দিয়ে করা হবে[৪১]), অত্যাচার থেকে মুক্তি চায়, যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্তি চায়।[৪২] কিন্তু মানুষকে এই অভিজ্ঞতার স্তর থেকে আরও উঁচু স্তরে উঠতে হবে, বুঝতে হবে যে সব সুখই ছলনা, সব তন্ত্রই মরীচিকা। ঈশ্বরের দিকে সবাইকে যেতে হবে। সমাজব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা পরম সত্যের দিকে এক একটি পদক্ষেপ মাত্র।[৪৩]

খ। স্বামীজি ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের একটি পদ (৪।৪) উল্লেখ করে বলেছেন, মানুষ ব্রহ্ম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর হতে পারে না, বিশ্বস্রষ্টা হতে পারে না। অর্থাৎ মানুষ যত উঁচুতেই উঠুক, ঈশ্বরের সঙ্গে তার ব্যবধান থাকবেই। এই প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করেছেন। (ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭-৪২ ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১২-১৩)। এই আলোচনায় অদ্বৈতবাদের নতুন ব্যাখ্যার ইঙ্গিত আছে। আগ্রহী পাঠক হক্সলির Grey Eminence উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায় পড়ে দেখতে পারেন।

উল্লেখপঞ্জী :

১. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭২।
২. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৪২।
৩. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩।
৪. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৯০।
৫. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯২-৯৩ ; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৭, ২০৫ ; চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২০৬ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৭৮, ৩০৮ ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১১৯-২২।
৬. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃ. ১১৫-১৬।
৭. ইংরেজি রচনাবলি, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৮৯।
৮. তদেব ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১১৯-২২।
৯. ইংরেজি রচনাবলি, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৮৯।
১০. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৫৩।
১১. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২২২।
১২. ইংরেজি রচনাবলি, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৮।
১৩. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৮।
১৪. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৮-৬৯ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২০২।
১৫. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৩৮।
১৬. ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২৩-২৪।
১৭. তদেব, পৃ. ৪২৪।
১৮. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১২-১৩।
১৯. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৯১।
২০. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৩১-৩২।
২১. তদেব, পৃ. ৩৩।
২২. তদেব, পৃ. ২৯-৩০।
২৩. তদেব, পৃ. ৩০।
২৪. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃ. ৯১-৯২।
২৫. তদেব, পৃ. ৮৪।
২৬. ইংরেজি রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৮।
২৭. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪।
২৮. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

২৯. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩৩০ ।

৩০. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮১ ।

৩১. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩৩০ ।

৩২. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৫ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৮২ ।

৩৩. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৪ ।

৩৪. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮২ ।

৩৫. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২০২ ।

৩৬. তদেব, পৃ. ১৯২, ২১৩ ।

৩৭. তদেব, পৃ. ১৯৩ ।

৩৮. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২৪ ; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮২ ।

৩৯. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২১ ।

৪০. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৪ ।

৪১. তদেব, পৃ. ৩১৬ ।

৪২. তদেব, পৃ. ২০২ ।

৪৩. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮২ ।

ইতিহাসের ধারা

বৈদান্তিক দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র মায়া, সব শাসনপদ্ধতি ও সমাজব্যবস্থাই মায়া, যদিও বিবেকানন্দ 'মায়া'র যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে সব পর্যায়েরই আপেক্ষিক সত্যতা আছে। সব তন্ত্রই সিঁড়ির এক এক ধাপ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, ইতিহাসও মায়া। ইতিহাস মানে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির উত্থান-পতন, বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠীর উত্থান-পতন। সমুদ্রের ঢেউ উঠছে, নামছে। বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।[১] আর এক ইতিহাস আছে, যা মানব-সভ্যতার সত্যতর ইতিহাস: শাশ্বত সত্যের সন্ধান, জড়ের আবরণ ভেদ করে চৈতন্যের উন্মেষ, জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি।[২] এই দিক থেকে দেখলে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, আর মানুষের ইতিহাস কয়েকজন মহাপুরুষের ইতিহাস, যাঁরা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।[৪] সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেখানে ত্যাগের প্রকাশ হয়েছে, সেখানেও ইতিহাসের এই গভীরতর সত্য উন্মোচিত।[৫]

কিন্তু বিবেকানন্দ লৌকিক ইতিহাসের আপেক্ষিক সত্যকে উপেক্ষা করেন নি। পৃথিবীর নানা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে যে তাঁর সম্যক্ পরিচয় ছিল তার প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন ভাষণ ও লেখায় ছড়িয়ে আছে, বিশেষভাবে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজকের ডায়েরী', 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি রচনায়। প্রমাণ আছে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিচারণে। ঐহিক স্তরে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি সামগ্রিক রূপও তিনি দেবার চেষ্টা করেছেন, সমাজের রূপান্তরের পেছনে যে নিয়ম কাজ করছে তার সন্ধান করেছেন। পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা বলেছেন; স্বামীজির মতে পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণসংঘাতের ইতিহাস (যদিও স্বামীজির দৃষ্টিতে 'বর্ণ' ও 'শ্রেণী' প্রায় সমার্থক)—এক এক পর্যায়ে এক এক বর্ণের প্রাধান্য (ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তিনি দেখেছেন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব[৬])। এখন পৃথিবীতে বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের প্রভুত্ব চলেছে, এর পরে আসবে শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণীর প্রভুত্ব। অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ বলে কিছু নেই, প্রত্যেক শাসনব্যবস্থার মধ্যেই হিতকর ও অহিতকর দিক আছে। স্বামীজি বলেছেন, পরম অর্থে প্রগতিবাদ অর্থহীন[৭]; কিন্তু যে ব্যবস্থায়

জাগতিক অর্থেও (শুধু আধ্যাত্মিক অর্থে নয়) বহুর কল্যাণ, সে ব্যবস্থা তিনি শ্রেয় মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম।[৮] কিন্তু এই ঐহিক কল্যাণকে ওপরে উঠবার ধাপ হিসেবে দেখতে হবে, জড়বাদের আবর্তে ডুবে গেলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, বুঝতে হবে যে চৈতন্যের জাগরণই মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য। এই কারণেই তিনি পশ্চিমের উপযোগবাদ অগ্রাহ্য করেছেন।[৯] নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজির সব কথাই শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদে পৌঁছয়।[১০] লৌকিক স্তরে সময় ও ইতিহাসের গতি এবং সমাজের রূপান্তর নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তা-ও অদ্বৈতবাদে পৌঁছেচে। কখনও তিনি ওপর থেকে নিচে নেমেছেন, আবার কখনও নিচের ধাপ থেকে ওপরে উঠেছেন।

উল্লেখপঞ্জী :

১. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৫, ৩৮০, ৪৩৩।
২. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২০২ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪২৯।
৩. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪২।
৪. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২২৮।
৫. তদেব, পৃ. ২৪০।
৬. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৫ ; নিবেদিতা, *Notes of Some Wanderings*, পৃ. ২৫।
৭. ইংরেজি রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪১৮।
৮. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৪৯।
৯. ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮২।
১০. নিবেদিতা, *Notes of Some Wanderings*, পৃ. ৬।

ভারতে ইংরেজশাসন : অমৃত ও গরল

আমরা দেখেছি, ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করে বিবেকানন্দ এই তত্ত্বে পৌঁছেচেন যে সমাজ বিবর্তনের এক এক পর্যায়ে এক এক বর্ণের আধিপত্য। তাঁর মতে, আধুনিক যুগে পৃথিবীতে বৈশ্যবর্ণের প্রাধান্য[১], ইংরেজশাসিত ভারতেও বৈশ্য-শক্তিরই প্রভুত্ব। ইংরেজ শাসককুল বৈশ্যশক্তির প্রতিভূ : 'সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।'[২] সব কিছুরই ভালোমন্দ দু'দিকই আছে, ইংরেজশাসনেরও তাই। স্বামীজি বলেছেন, পররাজ্য বিজয় খুবই খারাপ, বিদেশী শাসন খুবই খারাপ, কিন্তু অশুভের মাধ্যমেও শুভশক্তির বিকাশ হয়।[৩] ইংলণ্ডের ভারতবিজয় স্বামীজির ভাষায় এক 'অভিনব ব্যাপার' (কারণ বৈশ্যশক্তি এই প্রথম ভারতে ক্ষমতা দখল করেছে), এর লোকহিতকর কল্যাণপ্রদ দিকও অনেক।[৪] এক, পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের অধঃপতন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এমন শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র এদেশে আর দেখা যায়নি।[৫] বৃটিশ শাসনে ভারতে অর্ধশতাব্দীকাল শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে, আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৬] দুই, ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসার স্বার্থে পৃথিবীর এক প্রান্তের পণ্য আর এক প্রান্তে নিয়ে আসছে, তার ফলে যোগা-যোগ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে।[৭] তিন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে দেশদেশান্তরের ভাবরাশি প্রবলবেগে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে—এই সব ভাবের মধ্যে কিছু খুবই কল্যাণকর, কিছু অহিতকর।[৮] বিষ ও অমৃত দুইই আসছে।[৯] চার, ইংরেজ সভ্যতা—তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা—গ্রীক সভ্যতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্পের আসল উৎস গ্রীকদের বিজ্ঞানচিন্তা ও শিল্প-কর্ম। ইংরেজদের ভারত বিজয়ের ফলে দুই প্রাচীন সংস্কৃতি—গ্রীক ও ভারতীয়—মুখোমুখি হয়েছে, এই সম্মিলনের ফলে এক নতুন জীবনবোধ গড়ে উঠবে। সংকীর্ণতার বদলে আসবে ব্যাপ্তি, প্রসারতা।[১০] গ্রীক জীবনদৃষ্টি বহির্মুখী : প্রত্যক্ষ পার্থিব জগতের বাইরে তারা তাকায়নি, তাদের সৌন্দর্যবোধ বহিঃপ্রকৃতিকে ঘিরে, তাদের দেবদেবীদের কামনা ও অনুভবও একান্তভাবেই মানবিক।[ক] প্রাচ্যের জীবন-

ক. বিবেকানন্দ অবশ্য বলেছেন যে পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং মিশরীয় নব্য-প্লেটো-পন্থীদের দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার মিল আছে। (ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৪।)

চেতনা অন্তর্মুখী, পার্থিব জগৎকে ছাড়িয়ে অনন্ত সত্যের সন্ধান করেছে।[১১] ইংলণ্ডের ভারতবিজয়ের ফলে দুই বিরোধী জীবনদর্শনের সংঘাত দেখা দিয়েছে, এই সংঘাতে ভারত দীর্ঘদিনের ঘুম থেকে জেগে উঠছে, নতুন চিন্তার – স্বাধীন চিন্তার – উন্মেষ হয়েছে।[১২] দুই সভ্যতার সংমিশ্রণে ভারতে এক আদর্শ সমাজ জন্ম নেবে, পৃথিবীতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হবে[১৩]

ইংরেজ শাসককুল বৈশ্যশক্তির প্রতিনিধি, কিন্তু সাধারণ ইংরেজদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়গুণের প্রাধান্য। বিবেকানন্দ বলেছেন, ওরা খাঁটি ক্ষত্রিয়, বীরের জাত।[১৪] এক ডুবন্ত জাহাজের ইংরেজ যাত্রীদের আচরণ তাঁর চোখে এক উজ্জ্বল আদর্শ : মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তারা ভয় কাপুরুষতা স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়নি।[১৫] বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, ওদের কল্পনাশক্তি কম, অনুভবের ক্ষমতা কম, ব্যবহারিক দিকেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ওরা আবেগ ঢেকে রাখার শিক্ষা পেয়েছে ; তাই ওদের সম্বন্ধে অন্যেরা ভুল ধারণা পোষণ করে। নিবিড় পরিচয়ে ওদের অন্তরপ্রকৃতির ঐশ্বর্যের ও হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬] পরস্পরের প্রতি ওদের ঈর্ষা নেই – স্বাধীনতাপ্রিয়তার সঙ্গে আজ্ঞানুবর্তিতা ও কর্তব্য-পরায়ণতার আশ্চর্য সমন্বয় ওদের চরিত্রে রয়েছে।[১৭] কোনো ইংরেজ যখন কোনো কিছু ধরে, তখন তার ভেতরে ঢুকে যায়[১৮] – ত্যাগের আদর্শে সাড়া দেবার মতো অনেক লোক সেদেশে আছে।[১৯] ইংরেজরা খুব রক্ষণশীল, নতুন কোনো ভাব সহজে নিতে চায় না। কিন্তু নতুন কোনো ভাব যদি ওদের মাথায় একবার ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, কিছুতেই আর তা ছাড়ে না এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর কোনো জাতিতে নেই – সেজন্যেই সভ্যতায় ও শক্তিতে ওরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছে।[২০]

ইংলণ্ডের ভারতবিজয়ের হিতকর দিক এবং ইংরেজদের চরিত্রের বিভিন্ন গুণ স্বামীজি সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইংরেজশাসনের – ও পশ্চিমী জড়বাদী সভ্যতার – ভয়াবহ সর্বগ্রাসী চেহারাও তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, বিদেশী শাসন থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না, শাসকদের একমাত্র লক্ষ্য টাকা। তারা এদেশে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বানিয়েছে সেখানে ক্রীতদাস তৈরি হয় – কেরানি, পোস্টমাস্টার, বৈদ্যুতিক বার্তার যন্ত্রচালক।[২১] শিক্ষার জন্যে সরকারী ব্যয় অকিঞ্চিৎ-কর।[২২] ইংরেজসভ্যতা মানে তিন 'ব' – বাইবেল, বেয়নেট ও ব্র্যাণ্ডি। এই সভ্যতার পেষণে অর্থনৈতিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছে যে একজন ভারতীয়ের মাসিক আয় মাত্র পঞ্চাশ সেণ্ট।[২৩] মেরী হেলকে তিনি লিখেছেন, ইংরেজশাসনের ফলে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে, এটা

ভালো দিক। কিন্তু ইংরেজরা এদেশের লোকের কল্যাণের জন্যে যোগাযোগের পথ খুলে দেয়নি, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য রক্তশোষণ। পুরনো শাসন এর চেয়ে ভালো ছিল ; তখন এদেশের সব সম্পদ বাইরে চলে যেতনা, কিছু স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার ছিল। ইংরেজরা ভারতে কয়েকশ অত্যাধুনিক অর্ধশিক্ষিত জাতীয়তাবোধহীন লোক সৃষ্টি করেছে, আর কিছু করেনি। ১৮৫৭-৫৮ সালে তারা হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে, আর বৃটিশ-শাসনের অনিবার্য পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসার বন্ধ করা হয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, অল্প কয়েক বছর যে সামান্য স্বায়ত্তশাসন চালু করা হয়েছিল তা-ও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ইংরেজশাসন সম্পর্কে নিরীহ সমালোচনাও বরদাস্ত করা হয় না, শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বিনা বিচারে বহু লোক বন্দী, কখনঃকার প্রাণ যাবে কেউ জানে না। ভারতে এখন সন্ত্রাসের রাজত্ব। ইংরেজ সৈন্যরা পুরুষদের হত্যা করছে, মেয়েদের অসম্মান করছে, এবং পুরস্কার হিসেবে পেনশন দিয়ে তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে টাকা যোগান দিচ্ছে ভারতীয়রাই। স্বামীজি লিখেছেন, তাঁর এই চিঠি ছাপা হলে নতুন আইন অনুযায়ী ইংরেজ সরকার তাঁকে জোর করে আমেরিকা থেকে ভারতে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে হত্যা করবে।[২৪] 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে স্বামীজি লিখেছেন, প্রজারা সমাজের নেতৃত্বের বা রাজার শক্তির আধার। যে নেতারা প্রজাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করেন, তাঁদেরই উন্নতি, এই যোগসূত্র ছিঁড়ে গেলে অবনতি। আজ সেই যোগসূত্র ছিঁড়ে গেছে : 'এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে ; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; এইস্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।'[২৫] আমেরিকায় এক ভাষণে স্বামীজি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, ইতিহাসের প্রতিশোধ অবশ্যম্ভাবী। অত্যাচারী ইংরেজদের একদিন শাস্তি পেতে হবে, ঈশ্বর ও ইতিহাসের প্রতিশোধ আসবে চীনের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।[২৬]

এইসব উক্তিতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বামীজির তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।[খ] কিন্তু ভারতের অবনতির সব দায়িত্ব তিনি ইংরেজদের ওপর চাপিয়ে

খ. অনেকের মতে, বিবেকানন্দ প্রকাশ্যভাবে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। এই মত পুরোপুরি ঠিক নয়। আমেরিকায় কয়েকটি ভাষণে তিনি ইংরেজশাসনের ও ইংরেজ সভ্যতার তীব্র সমালোচনা করেছেন (ইংরেজি রচনাবলি, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৯ ৭০ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৬-১৭ ; সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৭৮-৮০ ; প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩)। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধেও ইংরেজশাসনের নেতিবাচক দিক স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

দেননি। তিনি বলেছেন, বেদান্তের শিক্ষা এই যে আমরা প্রথমে নিজেদের ক্ষতি না করলে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারে না। আমরা যেন অন্য কাউকে দায়ী না করি, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা নিজেরাই দেশের শোচনীয় অবস্থার জন্যে দায়ী। নানারকম অত্যাচার অনিয়ম ও অপুষ্টির জন্যে শরীর ভেঙে গেলে তখনই বাইরের জীবাণু আক্রমণ করার সুযোগ পায়; আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে বলেই বাইরের শক্তির অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে।[২৭] স্বামীজি ভারতীয়দের কয়েকটি মৌলিক দুর্বলতার কথা বলেছেন: শারীরিক দুর্বলতা, আলস্য, স্বার্থপরতা, ভীরুতা, ঈর্ষা, ক্রীতদাসের মনোভাব, সাহেবদের হাস্যকর অনুকরণ, আত্মবিশ্বাসের অভাব, দৃঢ়তার অভাব, অশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক চেতনার অভাব, দেশপ্রেমের অভাব, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা, মাতৃশক্তির অবমাননা, কথা ও কাজের ব্যবধান, দরিদ্র মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা, এবং সর্বোপরি বর্ণাভিমান ও অনৈক্য। ইংরেজ রাজত্বে ভারতে আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে কেউ নেই সবাই শূদ্রে পরিণত হয়েছে। ইংরেজরাই অধ্যাপক, সৈনিক ও ব্যবসায়ী: 'ভারতের ব্রাহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরাজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব।...এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলদের "যেন-তেন-প্রকারেণ" সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে।'[২৮] এদেশে আমরা সবাই আজ শূদ্র, কিন্তু এখনও মিথ্যা বর্ণাভিমান ছাড়তে পারি না। যে অন্য লোককে স্বাধীনতা দিতে রাজি নয় সে নিজেও স্বাধীনতা পেতে পারে না। যদি ইংরেজরা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তাহলে যারা ক্ষমতার আসনে বসবে তারা জনগণকে দাবিয়ে রাখবে, তাদের কোনো স্বাধীনতা দেবে না। ক্রীতদাসেরা ক্ষমতা চায় অন্য লোককে ক্রীতদাস বানাবার জন্যে।[২৯] ইংরেজরা আমাদের কৃষ্ণকায় বলে ব্যঙ্গ করলে আমরা অপমানিত বোধ করি না, কিন্তু নিজের দেশের নিচু বর্ণের মানুষদের প্রতি আমাদের অপরিসীম ঘৃণা।[৩০] আমাদের ধর্ম রান্নাঘরে ঢুকেছে। আমাদের ঈশ্বর রান্নার বাসন, আর আমাদের ধর্ম: 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি পবিত্র'। এই অবস্থা আর এক শতাব্দী চললে প্রত্যেককে পাগলা-গারদে ঢুকতে হবে।[৩১] স্বদেশের মানুষ আমাদের প্রথম উপাস্য দেবতা, এই সত্য আমরা ভুলে গেছি।[৩২]

উল্লেখপঞ্জী :

১. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ১৭।
২. তদেব।
৩. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭১।
৪. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ১২, ১৮, ৪৩।
৫. তদেব, পৃ. ৪৩।
৬. ইংরেজি রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৬।
৭. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৩ ; 'বর্তমান ভারত', পৃ. ১৭, ৪৩।
৮. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৪৩।
৯. 'ভাব্‌বার কথা', পৃ. ১৫।
১০. ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭১ ; 'ভাব্‌বার কথা', পৃ. ১১।
১১. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৪২-৪৪ ; 'ভাব্‌বার কথা', পৃ. ১১।
১২. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৪৩, ৪৭।
১৩. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০ ; ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড. পৃ. ২১৬।
১৪. ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১২।
১৫. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৫১।
১৬. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১২, ৪৩০।
১৭. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭৬।
১৮. তদেব, পৃ. ৩৪৪।
১৯. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২২।
২০. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ৬।
২১. ইংরেজি রচনাবলি, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭০।
২২. তদেব, পৃ. ৪৭৭।
২৩. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৭।
২৪. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫-৭৭।
২৫. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৪০-৪১।
২৬. ইংরেজি রচনাবলি, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৭৯-৮০।
২৭. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৬৭ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৭০।
২৮. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৩৬-৩৭।

২৯. ইংরেজি রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

৩০. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৪৫।

৩১. ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

৩২. তদেব, পৃ. ৩০১।

দেশপ্রেম : মানবপ্রেম : বিশ্বপ্রেম

ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ,…ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ…[১]

বিবেকানন্দ বলেছেন, আমরা অনেক যুগ ধরে ক্রীতদাস হয়ে আছি, তাই ক্রীতদাসের সংস্কার আমাদের মজ্জাগত। যদি আমাদের দেশের কোনো লোক মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, আমরা সবাই তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু সাহেবের লাথি আমরা নিঃশব্দে হজম করি।[২] পাশ্চাত্যের অনুকরণের মোহ এমনই প্রবল হয়েছে যে আমরা আর যুক্তি দিয়ে ভালো-মন্দের বিচার করি না। সাহেবরা যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাই আমরা ভালো বলে মেনে নিই; তারা যার নিন্দে করে তা-ই আমাদের চোখে খারাপ। এটাই 'প্রবল বিভীষিকা'।[৩] এই পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতার সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে আসতে হবে, স্বদেশবাসীর প্রতি অবজ্ঞা ও ঈর্ষার মনোভাব কাটিয়ে উঠতে হবে।[৪] বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে আহ্বান করে বলেছেন, আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের একমাত্র উপাস্য হোক স্বদেশবাসী, আমাদের দেশমাতৃকা। আর সব দেবদেবীর ছবি আমাদের মন থেকে মুছে যাক। সকলের পক্ষে কি যোগী হওয়া, ধ্যানী হওয়া সম্ভব? সারাদিন পরে সন্ধেবেলায় বসে তিনবার প্রাণায়াম করলেই কি ঋষিরা আকাশপথে তোমার কাছে উড়ে আসবেন? এ কি তামাশা? যা দরকার তা চিত্তশুদ্ধি, হৃদয়ের পবিত্রতা। এই চিত্তশুদ্ধির জন্যে আমাদের দেশবাসীকে পুজো করতে হবে, দেশের মানুষকে, দেশের সব প্রাণীকে। আমাদের স্বদেশই একমাত্র জাগ্রত দেবতা—সর্বত্র তাঁরই হাত, সর্বত্র তাঁরই পা, সর্বত্র তাঁরই কান, তিনি সব কিছু ঢেকে আছেন।[৫]

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥[৬]

সমস্ত প্রাণীর হাত ও পা তাঁরই; সমস্ত জীবের চোখ মাথা ও মুখ তাঁরই; সমস্ত প্রাণীর কানও তাঁরই; তিনি সকলের মধ্যে সমস্ত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।

এই সর্বব্যাপী বিরাটকে ছেড়ে আমরা মিথ্যা কুহকের পেছনে ছুটছি।[৭] ভারত

তখনই বড় হবে, যখন ভারতবাসী দেশের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে পারবে।[৮] কয়েকজন যুবক চাই, যারা ত্যাগী, দেশপ্রেমিক।[৯] দেশকে ভালোবাসতে হলে, দেশবাসীকে ভালোবাসতে হলে তীব্র সংবেদন চাই, দেশের লক্ষ লক্ষ দুস্থ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা চাই। চাই বজ্রদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়তা, তন্ময়তা। আর চাই দোষত্রুটি সব নিয়ে এই দেশকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। আমাদের জাতীয় তরণী শতাব্দীর পর শতাব্দী বয়ে চলেছে, এ নৌকো আজ অনেকটা জীর্ণ, অনেক জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ অনেক গলদ। এ দেশের রীতিনীতিতে, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যুক্তিহীন কুসংস্কারের আবিলতা। কিন্তু দোষত্রুটি আছে বলে আমরা তো এই সমাজকে বর্জন করতে পারি না, দেশমাতৃকাকে ত্যাগ করতে পারি না![১০] ভারতের অতীতের কথা, গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের কথা মনে রাখতে হবে। আর দেশকে ঐকান্তিকভাবে ভালোবেসে দরজায় দরজায় গিয়ে ডাক দিতে হবে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে দেবশক্তি আছে তাকে জাগাতে হবে।[১১] শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজি বলেছেন, ইচ্ছে করলে তো আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি। তবে কেন তা করি না? কেনই বা এ দেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারি না।[১২]

বিদেশে বিভিন্ন ভাষণে ও মন্তব্যে তাঁর এই জ্বলন্ত দেশপ্রেমের পরিচয় আমরা সবচেয়ে বেশি করে পাই। দেশবাসীর কাপুরুষতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, ভারতীয় সমাজের দুর্বলতা ও গ্লানি তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানত? বিভিন্ন চিঠিতে তাঁর তীব্র কশাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।[১৩] কিন্তু বিদেশীদের কাছে তিনি এঁকেছেন ভারতের মহনীয় রূপ, তাঁর ধ্যানের ভারতের ছবি। মাদুরায় এক ভাষণে তিনি বলেছেন, ভারতে আজ সনাতন ধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্লাবন এসেছে। এর ভালো দিক আছে। কিন্তু খারাপ দিকও আছে। অতীতের পুনরুজ্জীবন অনেক সময়ে চরম সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির জন্ম দেয়। এই বিপদ সম্পর্কে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন।[১৪] পশ্চিমের স্থূল জড়বাদ যেমন আমাদের বর্জন করতে হবে, তেমনি বর্জন করতে হবে ধর্মের নামে কুসংস্কার।[১৫] বর্ণভেদ ও বাল্যবিবাহ—হিন্দুসমাজের এ দুটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন আন্দোলন করে গেছেন, সতীদাহপ্রথার নিষ্ঠুর বর্বরতার কথা বলেছেন।[১৬] কিন্তু বিদেশীরা যখন ভারতবাসীর ও হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের নিন্দে করেছে, তখন তিনি সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব প্রথার সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

বর্ণভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে বর্মের কাজ করেছে, হিন্দুসমাজকে স্থায়িত্ব দিয়েছে, বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে।[১৭] হিন্দু মেয়েদের পরদানশিন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, হিন্দু পুরুষরা মেয়েদের এত শ্রদ্ধা করে যে তাদের অন্তঃপুরের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখাই শ্রেয় মনে করে।[১৮] বাল্যবিবাহের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এই প্রথা হিন্দুসমাজকে শারীরিকভাবে দুর্বল করেছে, কিন্তু সমাজকে নৈতিক শুদ্ধতা দিয়েছে, সমাজের নৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখেছে।[১৯] বালবিধবাদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, হিন্দুসমাজে তাদের নিগ্রহের প্রচার সম্পূর্ণ অসত্য।[২০] এটা ঠিক যে তারা আবার বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু হিন্দুসমাজে বিয়ে একটা সামাজিক কর্তব্য, জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবং সেখানে বিয়ে করতে না পারা কোনো বিশেষ কষ্টের কারণ হয় না। বিবেকানন্দ এ কথাও বলেছেন যে হিন্দুসমাজে বৈধব্য এত পবিত্র, বিধবাদের স্থান এত উঁচুতে যে সেখানে সবাই বৈধব্য কামনা করে। [২১] ভারতে মৃত স্বামীর চিতায় সদ্যবিধবাদের জোর করে পোড়ানো হত একথা অস্বীকার করে তিনি বলেছেন, স্বামীর বিরহ সহ্য করতে না পেরে তারা সব বাধা ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে স্বেচ্ছায় সহমরণ বরণ করত, এবং এই আত্মাহুতির জন্যে বিশেষভাবে বন্দিত হত।[২২]

২

বিদেশীদের কাছে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অনুশাসন ও প্রথার অনুকূলে বিবেকানন্দ যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলি আমাদের কাছে গ্রহণীয় না-ও মনে হতে পারে, কিন্তু এই সব যুক্তির পেছনে যে মানসিকতা কাজ করেছে তা আমরা বুঝতে পারি। তা এই দুর্গতিলাঞ্ছিত হতভাগ্য দেশের প্রতি তাঁর বেদনাসিক্ত প্রেম। স্বদেশে তিনি এই সব কুপ্রথা দূর করে সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষ চরিত্র আছে, সে চরিত্র পাল্টানো যাবে না। ভারতের বৈশিষ্ট্য ধর্মবোধ ও অধ্যাত্ম-চেতনা। সে ধর্মবোধের মূল কথা ত্যাগ, সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তির আত্মবিসর্জন। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে ভারতবাসী প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে, কিন্তু তারা তাদের নৈতিক চেতনা হারায় নি, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই নীতিবোধকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। হিন্দুসমাজের যে সব রীতি ও বিধান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী

আজকের মানুষের চোখে অসংগত মনে হয়, তাদের মূল উৎস খুঁজতে হবে এই জীবনবোধে।[২৩]

বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে—বিশেষভাবে ভারতের তরুণদের—'জ্বলন্ত দেশপ্রেম' ও দেশের জন্যে আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন[২৪], কিন্তু তিনি স্বাজাত্যবোধের সংকীর্ণতার কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, দেশপ্রেম আংশিক সত্য।[২৫] স্বাজাত্যবোধের উন্মাদনায় আমরা অনেক সময়ে ভাবি যে ভারতের বাইরে আর কোনো দেশের অস্তিত্ব নেই, কারও কাছ থেকে আমাদের কিছু শিখবার নেই। এ ধরনের দেশপ্রেম নেতিবাচক।[২৬] সত্যের অনেক ধাপ, প্রত্যেক ধাপেরই আপেক্ষিক সত্যতা আছে।[২৭] দেশপ্রেম সত্যের একটি ধাপ। তার ওপরের ধাপে মানবপ্রেম।[২৮] শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজি বলেছেন, প্রথমে সমস্ত হিন্দু জাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে।[২৯] বেদান্তদর্শনের মূল সত্য আছে মানবপ্রেমে, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে, বিশ্বপ্রেমে।[৩০] শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন।[৩১] গীতায় (৪।১১) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

যে যেভাবে আমার উপাসনা করে, আমি সেইভাবেই তাকে অনুগৃহীত করি।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী : 'যত মত তত পথ'। ধর্মান্ধতা ত্যাগ করে আত্মজ্ঞানের পথে এগোতে হবে, সব মানুষের মধ্যে পরম এককে প্রত্যক্ষ করতে হবে। অদ্বৈতবাদ বিভিন্ন দেশের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ স্বীকার করে না। বিবেকানন্দ সেই সর্বজনীন ধর্মের কথা বলে গেছেন। কিন্তু সর্বজনীন ধর্মের অর্থ এই নয় যে পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম থাকবে। প্রত্যেক ধর্মের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতা স্বীকার করতে হবে, আবার বহুর অন্তরালে যে ঐক্য তা-ও উপলব্ধি করতে হবে।[৩২] এই ঐক্যের উপলব্ধিই পরম বোধি। সেই স্তরে পৌঁছলে সব ভেদবুদ্ধি চলে যাবে। সেই স্তরে যিনি পৌঁছবেন, তিনি শুধু মানবপ্রেমিক নন, বিশ্বপ্রেমিক।[৩৩] তাঁর প্রেম চেতন-অচেতন ভালো-মন্দ শুভ-অশুভ সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। বিবেকানন্দ বলেছেন, পতিতা, জেলখানার চোর, খুনী, অত্যাচারী, অসাধু, শয়তান, দুর্বল চরিত্রের লোক সবাই তাঁর চোখে ঈশ্বর। তিনি ভালো লোককে,

সাধুকে যেমন প্রণতি জানান, তেমনি অসাধু ও শয়তানকেও প্রণতি জানান। সবাই তাঁর শিক্ষক, সবাই তাঁর পরিত্রাতা।[৩৪]

উল্লেখপঞ্জী :

১. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৫৪।
২. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০০।
৩. 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৫০-৫১।
৪. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩০০, 'বর্তমান ভারত', পৃ. ৫২-৫৪।
৫. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০০-০১।
৬. শ্বেতাশ্বতর, পৃ. ৩।১৬।
৭. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০০।
৮. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১০।
৯. তদেব, পৃ. ৩৭১।
১০. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৯, ২২৫-২৭।
১১. তদেব, পৃ. ১৯৯।
১২. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১৫৯।
১৩. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০, ১৫-১৬, ২৭, ৩১, ৫৬, ৫৮, ৮০, ৮৬, ৯৫, ৯৬, ১১৭, ১২৭ ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৩, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৪, ২৮৬ ; সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩২৯, ৩৯৪।
১৪. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭২।
১৫. তদেব, পৃ. ২৭৮।
১৬. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯১ ; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৪১ ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৩ ; সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৭২ ; অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫ ; 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ২০৩-০৪।
১৭. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩০৭-০৮।
১৮. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬৬।
১৯. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০০-০১।
২০. তদেব, পৃ. ৫১৪।
২১. তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৪২-৪৩।

২২. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৯৭-৮, ৫০১, ৫০৮, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২০১-০২।

২৩. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪৮-৪৯, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০-২১, ৮৪-৮৭, ১৮৫-৮৬, ৩৬২, ৩৭০-৭২, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭৫, ১৪২-৪৩, ১৫৪-৫৮, ১৬০, ১৬৫, ১৯৯ ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪, ৩৯০-৯১, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৬, ২৮৯, ৪১৮, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৭, ৭৯, ২০৫, ২৬১।

২৪. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৭১।

২৫. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

২৬. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭২।

২৭. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

২৮. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১৬, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২১, ৩১০। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার মন্তব্য দ্রষ্টব্য (স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, নিবেদিতার ভূমিকা : 'For him, there existed only Humanity and Truth')।

২৯. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃ. ১৭৬।

৩০. স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০, ৩৯১-৯২, ৪২২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬৭, ৩৭৪, ৩৭৯-৮০, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৬, ৮১-৮৫, ১২৬, ১২৯, ২৪০, ২৭৬।

৩১. তদেব প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩-৪।

৩২. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১২৫, প্রথম খণ্ড পৃ. ১৯-২০, ৪২৩-২৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮০-৮৪।

৩৩. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২২ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২।

৩৪. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪ ; চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৬, ৪১৮-১৯।

—